

# ইসলাম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

---

## ইসলাম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ডেন্টের মো. আখতারুজ্জামান

মুহাম্মদ তামীয়ুদ্দীন

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ড. মোহাম্মদ ইউচুফ

মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ

ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন ব্যবস্থা, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনুষ সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাঝে তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলা ও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পদ পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন, মূদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটি এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সূজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ধর্মীয় শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ঠ করতে এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে নিজ ধর্মের মৌলিক রীতিসমূহের পরিচিতি প্রদান জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অষ্টম শ্রেণির জন্য ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পদ চেতনায় উত্তুক হয় সেসব দিক বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োজন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দশায়ী হয়ে উঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূল্ক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী গৃহীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ফ্লেক্সে বাংলা একাডেমির প্রযোজন বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলগ্রেচ্চ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশোধে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	আকইদ	১		সুরা আন-নাসুর	৬৪
	ইমান	২		আয়াতুল কুরসি	৬৫
	নিকাক	৩		সুরা আল-হাশেরের শেষ তিন আয়াত	৭২
	আল-আসমাউজ হুসনা	৭		আল-কুরআন ও নেতৃত্বিক শিক্ষা	৭৩
	রিসালাত	১০		মোনাজাতমূলক তিলচি হাদিস	৭৭
	খন্দমে নবুয়ত	১২		হাদিসের আলোকে নেতৃত্বিক শিক্ষা	৭৮
	আখিরাত	১৫	চতুর্থ	আখলাক	৮৪
	শাফাত্রাত	১৬		আখলাকের প্রকার	৮৪
	জান্মাত	১৮		কতিপয় আখলাকে হামিদাহ, দৈর্ঘ্য	৮৬
	জাহানাম	২০		আত্ম	৮৭
	ইমান ও নেতৃত্বিকতা	২২		নারীর মর্যাদা	৮৯
বিড়ীয়	ইবাদত	২৪		সমাজসেবা	৯১
	যাকাত	২৫		দেশপ্রেম	৯২
	যাকাত করজ হওয়ার শর্ত	২৮		গ্রন্থমসহিষ্ণুতা	৯৩
	যাকাতের মাসারিফ	৩০		আখলাকে দামিমাহ	৯৫
	যাকাতের পুরুত্ব ও তাৎপর্য	৩১		অহংকার	৯৬
	হজ	৩৩		অশীলতা	৯৭
	হজের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত	৩৭		পর্যবেক্ষণ	৯৮
	হজ পাঞ্জের নিয়ম	৩৮		হৃণা	১০০
	কুরআনি	৪১		চুরি	১০১
	আকিকা	৪৩		ঘূর্ষ	১০২
	কুরআনির শিক্ষা	৪৪		সন্তাস	১০৪
তৃতীয়	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৪৮		এইচআইডি এবং এইডস	১০৫
	কুরআন মজিদ	৪৯	পঞ্চম	আদর্শ জীবনচরিত	১১০
	তাজবিদ	৫১		হ্যারত সুলায়মান (আ.)	১১১
	নুন সাকিন ও তানবিলের বর্ণনা	৫২		হ্যারত মুহাম্মদ (আ.)	১১৪
	মীম সাকিনের বর্ণনা	৫৫		হ্যারত ইস্মা (আ.)	১১৭
	নাবিগ্রা তিলাওয়াত	৫৬		হ্যারত মুহাম্মদ (স.)	১১৯
	সুরা আল-কান্দর	৫৮		হ্যারত আয়েশা (রা.)	১২৫
	সুরা আল-ফিল্যাল	৬০		হ্যারত উমর ইবনু আব্দুল আজিজ (র.)	১২৮
	সুরা আল-ফিল	৬৩		হ্যারত ঝাবো বসরি (র.)	১৩২
	সুরা কুরাইশ	৬৬			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## প্রথম অধ্যায়

### আকাইদ (الْعَقَائِد)

#### পরিচয়

মুসলিম হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম ইসলামের মৌলিক কতিপয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। যেমন- আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসূল, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের একুশ মৌলিক বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাসকে আকাইদ বলা হয়। আকাইদ শব্দটি বহুবচন। একবচনে ‘আকিদাহ’ যার অর্থ বিশ্বাস। আকাইদের বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এর কোনো একটিকে অবিশ্বাস করলে কেউ মুসলিম হতে পারে না। অতএব আকাইদ হলো ইসলামের প্রধান ভিত্তি।

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ইমানের পরিচয় ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ইমানের প্রধান সাতটি বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি অটল বিশ্বাস (ইমান) স্থাপন ও অনুশীলনে উদ্বৃদ্ধ হব।
- নিফাকের (কপটতা) পরিচয় ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব এবং নিফাক পরিহার করার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- কপটামূলক আচরণ পরিহার করে চলতে আগ্রহী হব।
- আল্লাহ তায়ালার কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মহান আল্লাহর গুণবাচক নামে বিধৃত গুণ নিজ আচরণে প্রতিফলন ঘটাবো।
- রিসালাতের অর্থ, নবি-রাসূলের সংখ্যা, নবি-রাসূলের পার্থক্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারব।
- নবুয়ত ও রিসালাতের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খতমে নবুয়তের পরিচয়, তাৎপর্য ও প্রমাণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আখিরাত ও কিয়ামত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শাফাতাতের পরিচয় ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জাহানামের পরিচয় ও তা লাভের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- জাহানামের পরিচয় ও প্রকল্প এবং জাহানাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- নেতৃত্ব চরিত্র গঠনে ইমানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।

## পাঠ ১

### ইমান (ਿਮਾਨ)

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই ইমান বলা হয়। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদির ইত্যাদি বিষয় মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়াই হলো ইমান। যে ব্যক্তি এসব বিষয়কে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন তিনি হলেন মুমিন।

ইমানের তিনটি দিক রয়েছে। এগুলো হলো-

- ক. অন্তরে বিশ্বাস করা,
- খ. মুখে স্বীকার করা এবং
- গ. তদনুসারে আমল করা।

অর্থাৎ ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করার নাম হলো ইমান। প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য এ তিনটি বিষয় থাকা জরুরি। কেউ যদি শুধু অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে স্বীকার না করে তবে সে প্রকৃতপক্ষে ইমানদার বা মুমিন হিসেবে গণ্য হয় না। আবার মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলেও কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না। বস্তুত আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমলের সমষ্টিই হলো প্রকৃত ইমান।

### ইমানের সাতটি বিষয়ের বিবরণ

ইমান বা বিশ্বাসের মৌলিক বিষয় মোট সাতটি। মুমিন হওয়ার জন্য এ সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমরা পূর্বের শ্রেণিতে ইমানে মুফাস্সাল সম্পর্কে জেনেছি। তাতে ইমানের সাতটি বিষয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ পাঠে আমরা বিস্তারিতভাবে এ সাতটি বিষয় সম্পর্কে জানব।

#### ১. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের রব, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী, জন্ম ও মৃত্যুর মালিক। তিনি সকল গুণের আধার। তিনি পবিত্র, ক্ষমাশীল, দয়াবান, পরম দয়াময়, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

আল্লাহ তায়ালা অনন্ত অসীম। তিনি সবসময় ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তার সন্তা ও গুণাবলি অতুলনীয়। তিনি ঠিক তেমনই যেমনভাবে তিনি বিরাজমান। তার অসংখ্য সুন্দর নাম রয়েছে। তার পিতা, পুত্র এবং স্ত্রী নেই। তিনিই একমাত্র সন্তা। তার সমকক্ষ, সমতুল্য বা শরিক কেউ নেই। সমন্ত প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তারই প্রাপ্য। আল্লাহ তায়ালাকে তার সন্তা, গুণাবলি ও সকল ক্ষমতাসহ বিশ্বাস করাই হলো ইমানের সর্বপ্রধান বিষয়।

## ২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার জিকির ও তাসবিহ পাঠে রত। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত।

ফেরেশতাগণ অদৃশ্য। তবে আল্লাহর আদেশে তাঁরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা পুরুষ নন আবার নারীও নন। তাঁদের আহার-নিদার প্রয়োজন নেই। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেউই তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা জানে না। ফেরেশতাগণের মধ্যে ৪ জন হলেন প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন হ্যরত জিবরাইল (আ.), হ্যরত মিকাইল (আ.), হ্যরত আজরাইল (আ.) এবং হ্যরত ইসরাফিল (আ.)।

## ৩. আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবি-রাসূলগণের নিকট আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলো হলো আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণীসমষ্টি। এসব কিতাবে আল্লাহ তায়ালা স্থীয় পরিচয় ও ক্ষমতার বর্ণনা প্রদান করেছেন। মানুষের জীবনযাপনের জন্য নানা আদেশ-নিষেধ প্রদান করেছেন। এ কিতাবগুলো আসমানি কিতাব নামে পরিচিত। আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলগণের মাধ্যমে এসব কিতাব আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন।

আসমানি কিতাব সর্বমোট একশত চার (১০৮) খানা। তন্মধ্যে ১০০ খানা ছোট। এগুলোকে বলা হয় সহিফা। আর বাকি চার খানা বড়। এগুলো হলো- তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআন। আল কুরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় সন্তুষ্টিপূর্ণভাবে পরিচিত রয়েছে। এটি মুসলমানদের আসমানি কিতাব তথা পরিপূর্ণ জীবনবিধান।

## ৪. নবি-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। তাঁরা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা দিতেন। কোন পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে তা দেখিয়ে দিতেন। নবি-রাসূলগণ ছিলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা সর্বাধিক।

সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হ্যরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ নবি ও রাসূল হলেন হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি সাহিয়েদুল মুরসালিন বা রাসূলগণের সর্দার। তিনি আমাদের নবি, ইসলামের নবি। আমরা তাঁরই উমাত।

## ৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাত হলো পরকাল। দুনিয়ার জীবনের পর মানুষের আরও একটি জীবন রয়েছে। এ জীবন স্থায়ী ও অনন্তকালব্যাপী। এটাই হলো পরকাল। আখিরাত বা পরকালের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। কিয়ামত, কবর, হাশর, মিয়ান, সিরাত, জাহানাম ইত্যাদি আখিরাত জীবনের একেকটি স্তর।

আখিরাত হলো কর্মফল ভোগের স্থান। মানুষ দুনিয়ার জীবনে যেমন কাজ করবে আখিরাতে তেমন ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে আখিরাতে পুরস্কার পাবে। তার স্থান হবে জাহান। আর যে খারাপ কাজ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। তার ঠিকানা হবে জাহানামে।

## ৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তাকদির অর্থ ভাগ্য। তাকদির আল্লাহ তায়ালা থেকে নির্ধারিত। ভালো-মন্দ যা কিছু হয় সবই আল্লাহ তায়ালা'র হস্তে হয়। সুতরাং দুনিয়াতে ভালো কিছু লাভ করলে আনন্দে আত্মারা হওয়া যাবে না। বরং এটি আল্লাহ'রই দান। তাই আল্লাহ তায়ালা'র শুভ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে বিপদে-আপদে বা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে হতাশ হওয়া যাবে না। এর জন্য অন্যায় ও দুর্নীতি করা যাবে না। বরং এটি আল্লাহ তায়ালা'র তরফ থেকেই এসেছে। সুতরাং এ অবস্থায় সবর বা ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ'র নিকট সাহায্য চাইতে হবে। অতএব আমরা তাকদিরে বিশ্বাস করব এবং সাধ্যমতো নেক কাজ করব।

## ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

মৃত্যুর পর আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে। দুনিয়ার প্রথম মানব হ্যরত আদম (আ.) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলকেই আল্লাহ তায়ালা জীবিত করবেন। একেই বলা হয় পুনরুত্থান। এ সময় সবাই হাশেরের ময়দানে সমবেত হবে। আল্লাহ তায়ালা সেদিন প্রত্যেকের নিকট নিজ নিজ আমলের হিসাব চাইবেন। আমাদের সেদিন তার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সেখানে পাপ-পুণ্যের ওজন করবেন, হিসাব নেবেন। তিনিই হবেন একমাত্র বিচারক। অতঃপর ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

উল্লিখিত সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এগুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্মৃতি ও তদনুযায়ী আমল করলে আমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারব।

## ইমান আনার শুভ পরিণাম

ইমান আল্লাহ'র একটি বড় নিয়ামত। ইমানের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে। মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে শ্রদ্ধা, সম্মান, কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেন। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: “আর সম্মান তো কেবল আল্লাহ, তার রাসুল এবং মুমিনদের জন্যই।” (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ৮)

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রিয়পাত্র। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ভালোবাসেন। আখিরাতে তিনি মুমিনদের চিরশাস্তির জাহান দান করবেন। মুমিনগণ সেখানে চিরকাল থাকবেন। জাহানের সকল নিয়ামত ভোগ করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ كَانُوا لَهُمْ جِئْنُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا

অর্থ : “নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাঁদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জাহাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।” (সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ১০৭-১০৮)

আমরা ইমানের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে পড়ব। এ সম্পর্কে জানব এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। অতঃপর এগুলোর অনুসরণ করে নিজ জীবন গড়ে তুলব। আমরা সবসময় নেক কাজ করব। কখনো অন্যায় ও অত্যাচার করব না। এভাবে আমরা দুনিয়া ও আধিরাতে শান্তি ও সফলতা লাভ করতে সক্ষম হব।

#### কাজ : শিক্ষার্থীরা-

- ক. ইমানের সাতটি বিষয় লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।
- খ. ইমানের সাতটি বিষয়ের বিবরণ বাড়ি থেকে খাতায় লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।
- গ. দলে বিভক্ত হয়ে ইমান আনার কী কী শুভ পরিণাম রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

## পাঠ ২ নিফাক (النِّفَاقُ)

### পরিচয়

নিফাক শব্দের অর্থ ভঙ্গামি, কপটতা, প্রতারণা, দিমুঘী নীতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মুখে ইমানের স্বীকার ও অন্তরে অবিশ্বাস করাকে নিফাক বলা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিকরা সাধারণত সামাজিক ও পার্থিব লাভের জন্য এরূপ করে থাকে। তারা মুসলমান ও কাফির উভয় দলের সাথেই থাকে। প্রকাশ্যে তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে। কিন্তু গোপনে তারা ইসলামকে অস্থীকার করে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمْنَوا قَالُوا هُنَّا مَعْكُمْ ۝ وَإِذَا خَلَوْا إِلَيْنَا مَنَّا نَحْنُ  
○ مُسْتَهْزِئُونَ

অর্থ: “আর যখন তারা (মুনাফিকরা) ইমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা ইমান এনেছি। আর যখন তারা গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪)

এক কথায় অন্তরে কুফর রেখে মুখে মুখে ইমানের কথা প্রকাশকে নিফাক বলে। আর এরূপ প্রকাশকারী হলো মুনাফিক।

### মুনাফিকদের চরিত্র

নিফাক হলো নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শের বিপরীত কাজ। মুনাফিকদের চরিত্র দেখলে আমরা এ সত্য জানতে পাই। তারা সব ধরনের অন্যায় ও মন্দ কাজ করে থাকে। উন্নম আচরণ ও উন্নম চরিত্র তারা কখনোই

অনুশীলন করে না। বরং মিথ্যা ও প্রতারণাই তাদের প্রধান কাজ। আল্লাহ পাক বলেন-

وَاللَّهُ يَشْهِدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُلُّنُّوْنَ

অর্থ : “আর আল্লাহ সাক্ষ দেন যে, মুনাফিকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।” (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ১)

রাসুলুল্লাহ (স.) বহু হাদিসে মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

أَيُّهُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْتَمْ حَانَ-

অর্থ : “মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা হয় তখন তার খিয়ানত করে।” (বুখারি ও মুসলিম)

### নিফাকের কুফল ও পরিণতি

নিফাক জখন্যতম পাপ। এটা মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে ফেলে। নিফাকের ফলে মানুষ অন্যায় ও অশ্রীল কাজে অভ্যন্ত হয়ে যায়। ফলে মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়। নিফাকের দ্বারা মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে মানব সমাজে মারামারি, হানাহানি ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মুনাফিকরা ইসলামের চরম শত্রু। এরা বাইরে মুসলমান বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কাফিরদের পক্ষে কাজ করে। এদের গোপন শত্রুতা মুসলমানদের বিপদে ফেলে। এ শত্রুরা গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। ইসলাম ও মুসলমানদের গোপন কথা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। এরা মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ও মারামারি সৃষ্টির চেষ্টা করে। প্রকাশ্য শত্রুর তুলনায় গোপন শত্রু বেশি ক্ষতিকর। কেননা প্রকাশ্য শত্রুর বিবৃক্ষে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। কিন্তু যে গোপনে শক্রতা করে তাকে চেনা যায় না। তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষা করারও সুযোগ পাওয়া যায় না। ফলে সে বদ্ধ বেশে সহজেই বড় ক্ষতিসাধন করতে পারে। এসব কারণে দুনিয়াতে মুনাফিকরা ঘৃণিত ও নিন্দিত হয়। আর্থিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের কঠোর আয়ার। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّاسِ

অর্থ : “নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহানামের সর্বনিম্ন স্তরে।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৫)

আমরা সকলেই নিফাক থেকে বেঁচে থাকব। হাদিসে যেসব কাজ মুনাফিকের নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে আমরা সেগুলো বর্জন করব। খাঁটি মুমিন হিসেবে জীবনযাপনের চেষ্টা করব।

### নিফাক পরিহারের উপায়

১. কথা বলার সময় সত্য কথা বলবে, মিথ্যা কথা বলবে না।
২. কাউকে কথা দিলে তা রক্ষা করবে।
৩. আমানত রক্ষা করবে। যেমন কারো কাছে কোনো জিনিস ও সম্পদ আমানত রাখলে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে এবং ফেরত দিবে। কারো সাথে কথা দিলে তা রক্ষা করবে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করবে না।

#### কাজ : শিক্ষার্থীরা-

ক. দলে বিভক্ত হয়ে মুনাফিকের নিদর্শনগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খ. নিফাকের কুফল ও পরিণতি সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

### পাঠ ৩

## আল-আসমাউল হুসনা (الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى)

আল-আসমাউল হুসনা শব্দ দ্বয়ের অর্থ সুন্দরতম নামসমূহ। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহকে একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয়। আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালার এরূপ বহু গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিস শরিফে আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি গুণবাচক নামের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম অসংখ্য। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত হলো ৯৯টি নাম। যেমন- আলিম, খাবির, রায়খাক, গাফ্ফার, রাহীম, রাহমান ইত্যাদি।

#### গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল-আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নামগুলো তার পরিচয় ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়। এ নামগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। ফলে তার আদেশ-নিষেধ পালন করতে সহজ হয়।

এ নামগুলোর দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকতে পারি। এসব নামে ডাকলে তিনি খুশি হন। এসব নাম ধরে আমরা মোনাজাত করতে পারি। তিনি স্বয়ং বলেছেন-

وَإِلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَاٰ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۝ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ○

অর্থ : “আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাকে সে সকল নাম দ্বারাই ডাকো। যারা তার নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করো। অচিরেই তাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে।” (সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত: ১৮০)

আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ আমাদের উত্তম চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ অর্জনের জন্য মানুষ তার জীবনে চর্চা করলে সে সচেতনতা হয়। সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে-

صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

অর্থ : (আমরা গ্রহণ করলাম) “আল্লাহর রং, আর রঙে আল্লাহ অপেক্ষা আর কে অধিকতর সুন্দর?” (সূরা আল- বাকারা, আয়াত: ১৩৮)

আল্লাহর রং হলো আল্লাহর দীন ও তার গুণাবলি। আর সর্বোত্তম গুণাবলিতো আল্লাহরই। সুতরাং আল্লাহর গুণাবলির অনুসরণ করলে উত্তম চরিত্রবান হওয়া সম্ভব। নিম্নের্বর্ণিত আলোচনায় আমরা আল্লাহ তায়ালার কতিপয় গুণের সাথে পরিচিত হব।

#### আল্লাহ গাফ্ফারুন (أَللَّهُ غَفَارٌ )

গাফ্ফার শব্দের অর্থ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ গাফ্ফারুন অর্থ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ তায়ালার

ক্ষমা অপরিসীম। তিনি সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল। তিনি বলেন-

وَإِنِّي لَغَافِرٌ لِّمَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

অর্থ : “এবং আমি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ইমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচল থাকে।” (সূরা তা-হা, আয়াত: ৮২)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের বহু নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু অনেক মানুষই অহংকার ও মূর্খতাবশত আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যায়। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে শান্তি দেন না, বরং সুযোগ দেন। বাস্তা যদি তার পাপের জন্য অনুত্তম হয় এবং তাওবা করে তবে তিনি মাফ করে দেন। বড় বড় পাপীও যদি তাওবা করে তাহলেও তিনি ক্ষমা করেন। তার ক্ষমা তুলনাবিহীন। আমরা জানা-অজানায় অনেক গুনাহ করে ফেলি। তাই সবসময় আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইব। তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

### আল্লাহ সামাদুন (الله صَمَدْ)

সামাদুন শব্দের অর্থ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ সামাদুন অর্থ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আল কুরআনে তিনি নিজেই বলেছেন- أَلَّا إِلَهٌ مِّثْلُ الصَّمَدْ অর্থ: “আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।” (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ০২)

আল্লাহ তায়ালা খালিক বা সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত সবকিছুই মাখলুক বা সৃষ্টি। সকল সৃষ্টিই তার মুখাপেক্ষী। জন্ম-মৃত্যু, বেড়ে ওঠা সবকিছুর জন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার কুদরতের মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকল প্রয়োজন ও চাহিদার উর্ধ্বে। সব প্রকার লাভ-লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতি, দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত বা পবিত্র। বিশ্বজগৎ সৃষ্টিতে তার কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় নি। সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও তার কোনো সাহায্যকারীর দরকার নেই। বড় বড় সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত তার এক ছকুমেই তৈরি হয়ে যায়। জটিল জটিল সৃষ্টিও তার ‘হও’ বলার সাথে সাথে অস্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং তিনি সাহায্যকারী ব্যতীতই মহান স্তর্ষ।

তার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। এমনকি ইবাদত-বন্দেগি ও প্রশংসারও তিনি মুখাপেক্ষী নন। মানুষের নিজের কল্যাণের জন্যই ইবাদত-বন্দেগি করা প্রয়োজন। তিনি খাদ্য-পানীয়, নির্দা, বিশ্রাম ইত্যাদির উর্ধ্বে। এক কথায় তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী একমাত্র সন্তা।

আমরা আল্লাহ তায়ালার এ গুণটি উপলক্ষ্মি করব। যেকোন প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব। একমাত্র তারই মুখাপেক্ষী হবো। তার ওপর ভরসা করতে শিখব।

### আল্লাহ রাউফুন (الله رَءُوفٌ)

রাউফুন শব্দের অর্থ অতিশয় দয়াবান, পরম দয়ালু, অতি স্নেহশীল। আল্লাহ রাউফুন অর্থ- আল্লাহ অতি দয়াবান, অত্যন্ত স্নেহশীল। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার শেষ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

○ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ فَرَحِيمٌ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩)

আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার শেষ নেই। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি দয়া ও স্নেহের মাধ্যমে আমাদের প্রতিপালন করেন। তিনি মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মায়া-ভালোবাসা সঞ্চার করে দেন। তাঁরা আমাদের সেবা দিয়ে বড় করেন। আমরা নাফরমানি করলেও তিনি দুনিয়াতে আমাদের তৎক্ষণাত্ম শান্তি দেন না। বরং করুণাবশত আমাদের সুযোগ দেন। আমরা তাওবা করলে তিনি দয়া করে আমাদের ফর্মা করেন। আমাদের রহমত ও বরকত দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতের সব কল্যাণই তাঁর দান। তিনি করুণা ও দয়ার আধার।

আমরাও আল্লাহ তায়ালার এ গুণের চর্চা করব। পরম্পরের প্রতি আমরা দয়াশীল হব। কাউকে আঘাত করব না। বরং স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে আপন করে নেব।

### আল্লাহ হাসিবুন (الله حَسِيبٌ)

হাসিবুন অর্থ হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ হাসিবুন অর্থ আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

○ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।” (সূরা আল-নিসা, আয়াত: ৮৬)

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। হাশরের ময়দানে তিনিই হবেন একমাত্র বিচারক। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

طِ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ

অর্থ : “তিনি (আল্লাহ) বিচার দিনের মালিক।” (সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৩)

সেদিন তিনি সব মানুষের হাতে আমলনামা প্রদান করবেন। আমলনামায় প্রত্যেকের সব কাজের হিসাব লেখা থাকবে। ছেট-বড়, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, গোপনে-প্রকাশ্যে কৃত সবধরনের কাজেরই সেদিন হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَايِسْكُمْ بِهِ اللَّهُ

অর্থ : “যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তারও হিসাব নেবেন।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৪)

সবাইকেই সেদিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। পাপ পুণ্যের হিসাব না দিয়ে সেদিন কেউই রেহাই পাবে না। আল্লাহ তায়ালা পুজ্ঞানুপুজ্ঞভাবে সবারই হিসাব নেবেন। এজন্যই তিনি হাসিব বা সৃষ্টি হিসাব গ্রহণকারী।

আমরা আল্লাহ তায়ালার এ গুণটির তাঁগর্য বুঝব। তারপর নিজেই নিজ আমলের হিসাব রাখব। প্রতিদিন রাতে ঐ দিনের পাপ-পুণ্যের হিসাব করব। অতঃপর পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং ভবিষ্যতে পাপ আর না করতে চেষ্টা করব।

### আল্লাহ মুহাইমিনুন (مُحَمَّدُ مُهَمَّدٌ)

মুহাইমিনুন শব্দের অর্থ নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আশ্রয়দাতা। আল্লাহ মুহাইমিনুন অর্থ আল্লাহ আশ্রয়দাতা। আল্লাহ তায়ালা হলেন প্রকৃত রক্ষাকর্তা। তিনিই একমাত্র এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। আল্লাহ তায়ালাই আমাদের রক্ষক। তিনি আমাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। শয়তানের কুম্ভণা থেকে তিনিই হেফাজত করেন। হিংসুক, জাদুকর, ঘড়যন্ত্রকারী, সকলের অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। তার সুরক্ষাই প্রকৃত সুরক্ষা। কেউ তার সুরক্ষা ভেদ করতে পারে না। তিনি যাকে রক্ষা করেন কেউ তার কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। সবসময় সকল বিপদে তারই আশ্রয় চাইতে হবে। আল কুরআন ও হাদিসের বহুস্থানে আমাদের এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়ন্বি (স.) তার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করব। তিনি আমাদের রক্ষা করবেন। আমরা বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করব, আশ্রয় দেব। ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর খুশি হবেন।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহর ১৫টি গুণবাচক নাম অর্থসহ লিখে একটি তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

## পাঠ ৪

### রিসালাত (الرِّسَالَةُ)

আকাইদের বিষয়সমূহের মধ্যে রিসালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাওহিদের পরই আসে রিসালাত। রিসালাত অর্থ সংবাদ বহন, খবর বা চিঠি পৌছানো। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার বাণী, আদেশ-নিষেধ মানুষের নিকট পৌছানোকে রিসালাত বলে। যাঁরা এ সংবাদ পৌছানোর কাজ করেন তাঁরা হলেন নবি-রাসূল। রিসালাত ও নবি-রাসূলের উপর বিশ্বাস করা ফরজ বা আবশ্যিক।

### নবি-রাসুলের সংখ্যা

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য বহু নবি-রাসুল এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি ছিল না যেখানে আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুল প্রেরণ করেননি। আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِيٌ

অর্থ : “আর প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।” (সূরা আর-রাদ, আয়াত: ৭)

কুরআন মজিদে আমরা মাত্র ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম দেখতে পাই। কিন্তু প্রকতপক্ষে তাঁদের সংখ্যা ছিল অনেক। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ

অর্থ : “অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইত: পূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আপনাকে বলিনি।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪)

কুরআন মাজিদে বা কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিসে তাঁদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি। এক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস রাখব আল্লাহ তায়ালা যত নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন তাঁদের সবার ওপর আমরা ইমান রাখি। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হ্যরত আদম (আ.), আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)।

### নবি-রাসুলের পার্থক্য

অর্থগত দিক থেকে এ দুটি শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যাঁদের প্রতি আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন কিংবা নতুন শরিয়ত প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন রাসুল। আর যার প্রতি কোনো কিতাব অবতীর্ণ হয়নি কিংবা যাঁকে কোনো নতুন শরিয়ত দেওয়া হয়নি তিনি হলেন নবি। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত প্রচার করতেন। এ হিসেবে সকল রাসুলই নবি ছিলেন। কিন্তু সকল নবি রাসুল ছিলেন না। যেমন- আমাদের মহানবি (স.) ছিলেন একাধারে নবি ও রাসুল। হ্যরত নূহ (আ.) এর উপরে কোন কিতাব নাজিল হয়নি কিন্তু তাঁর দ্বারা শরিয়তের বিধি-বিধান প্রচার ও প্রবর্তন হয়েছে। তিনিও রাসুল ছিলেন। অপরদিকে হ্যরত হারুন (আ.) ছিলেন মাত্র নবি। তাঁর প্রতি কোনো কিতাব নাজিল হয়নি। তিনি হ্যরত মুসা (আ.)-এর শরিয়ত প্রচার করতেন।

### রিসালাতের তাৎপর্য

নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ। তাঁরা সকলকে তাওহিদের পথে ডাকতেন। কুফর, শিরক, নিফাক থেকে সতর্ক করতেন। উচ্চ চরিত্র ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতেন। নবিগণের দাওয়াতের মূল কথা আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর বিধি-বিধান প্রচার করা। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

অর্থ : “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।” (সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত: ৭৩)

নবি-রাসুলগণের দায়িত্বকেই বলা হয় রিসালাত। এ রিসালাতের মর্ম বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: “আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।” (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬)

নবি রাসুলগণ আল্লাহ তায়ালার দেওয়া এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। যারা তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে তারা সফলকাম হয়েছে। আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয়নবি (স.) এর আনীত বিধান অনুসরণ করব, তাহলে আমরাও সফলকাম হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা রিসালাত পাঠটি নীরবে পড়বে অতঃপর রিসালাতের মর্ম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে  
শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ৫

### খতমে নবুয়ত (حَمْمُ النَّبَوَةِ)

#### পরিচয়

খতম শব্দের অর্থ শেষ, সমাপ্ত। আর নবুয়ত অর্থ পয়গম্বারি, নবিগণের দায়িত্ব ইত্যাদি। সুতরাং খতমে নবুয়ত অর্থ নবিগণের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি বা নবুয়তের সমাপ্তি। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেন। এ ক্রমধারা শুরু হয় হ্যরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে, আর হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়। নবুয়ত তথা নবি-রাসুল আগমনের এ ক্রমধারাটির সমাপ্তিকেই খতমে নবুয়ত বলা হয়।

যাঁর মাধ্যমে এ ক্রমধারা শেষ হয় তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়িন বা নবিগণের শেষজন। আর তিনি হলেন মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)।

#### তাৎপর্য

আমাদের প্রিয়নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি। তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়িন। তাঁর পর আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি আর কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। তাঁর মাধ্যমে নবি-রাসুলের আগমনের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খতমে নবুয়তের উপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না।

### খতমে নবুয়তের প্রমাণ

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের ক্রমধারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কুরআন-হাদিসের বহু স্থানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে আমরা খতমে নবুয়ত এর কিছু প্রমাণ স্পষ্টভাবে জানব।

### আল কুরআনের দলিল

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি মহানবি (স.)-কে খাতামুন নাবিয়িন বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

**مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلِكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ ط**

অর্থ : “মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি তো আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবি।” (সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত: ৪০)

### হাদিস শরিফের দলিল

বহু হাদিসে খতমে নবুয়তের প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে আমরা এ সম্পর্কে কতিপয় হাদিস জানব-

**أَنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِنِي**

অর্থ: “আমিই শেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি আসবেন না।” (সহিহ মুসলিম)

২. রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি ও রাসূল আসবেন না।” (জামি তিরমিয়ি)

৩. নবি করিম (স.) বলেন, “বনি ইসরাইলে নবিগণই নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোনো নবি ইন্তিকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবি আসবেন না।” (বুখারি)

৪. একটি হাদিসে মহানবি (স.) উপমার মাধ্যমে খতমে নবুয়ত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, “আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবিগণের দৃষ্টান্ত হলো একুপ যে, এক লোক একটি দালান নির্মাণ করল। খুব সুন্দর ও লোভনীয় করে তা সজ্জিত করল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান ফাঁকা ছিল। লোকজন দালানটির চারদিকে ঘুরে এর সৌন্দর্য দেখছিল আর বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, ‘এ কোণে একটি ইট রাখা হয়নি কেন? বন্তুত আমিই সে ইট এবং আমি শেষ নবি।’” (বুখারি)

পুরো দালানে একটি ইট লাগানো বাকি ছিল। ইট লাগাতেই সে দালান পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নবুয়াতও তেমনি একটি দালানের সদৃশ। সেই দালানের সর্বশেষ ইট মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁর মাধ্যমেই দালানের সর্বশেষ ইট লাগানো হয়। পরিপূর্ণ হয়ে গেল নির্মাণকাজ। ফলে নতুন করে দালানের আর কোথাও ইট লাগানোর প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ নবি আসারও দরকার পড়বে না।

### যৌক্তিক প্রমাণ

যুক্তির মাধ্যমেও আমরা খতমে নবুয়াতের প্রমাণ লাভ করতে পারি। যেমন- যুক্তির আলোকে দেখা যায় এক নবির পর অন্য নবি সাধারণত তিনটি কারণে আসতেন। যথা-

- ক. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেলে ;
- খ. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়লে কিংবা তাতে নতুন কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন হলে ;
- গ. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা কোনো বিশেষ স্থান বা কালের জন্য নির্দিষ্ট হলে ।

উপরিউক্ত কারণগুলোর কোনোটিই বর্তমানকালে প্রযোজ্য নয়। কেননা-

১. হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। এটি বিন্দুমাত্র বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়নি। সুতরাং নতুন কোনো নবি আসার প্রয়োজন নেই।
২. রাসূল (স.)-এর শিক্ষা এবং দীন ইসলাম পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। এতে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই। এতে কোনোরূপ সংযোজন ও বিয়োজনেরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন-

*الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَمْبَثْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا*

অর্থ : “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত:৩)

৩. নবি করিম (স.) কোনো বিশেষ স্থান বা কালের জন্য আসেন নি। বরং তিনি সর্বকালের সকলের নবি। কিয়ামত পর্যন্ত সকল স্থানের মানুষের নবি। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

*وَمَا آرَى سُلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بِشَيْرًا وَنِزِيرًا*

অর্থ: “আর আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।” (সূরা সাবা, আয়াত: ২৮)

*قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا*

অর্থ : “বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।” (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৫৮)

নবি আগমনের তিনটি কারণের একটিও বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং নতুন কোনো নবি আগমনেরও প্রয়োজন নেই। আমাদের নবিই শেষ নবি। তিনিই খাতামুন নাবিয়্যিন।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা খতমে নবৃত্যত পাঠটি নীরবে পড়বে। শ্রেণির সকলে মিলে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবে। এবার তিনজনের একজন খতমে নবৃত্যতের উপর কুরআনের দলিল, আরেকজন হাদিস শরিফের দলিল এবং অন্যজন ঘোষিক প্রমাণ উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখবে। তাদের বক্তব্য শ্রেণির সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। শিক্ষক মহোদয় সভাপতি ও সমস্বয়ক হিসেবে এ কাজে সহযোগিতা করবেন। সকলে অনুষ্ঠান শেষে বক্তাদের ধন্যবাদ জানাবে।

## পাঠ ৬

### আখিরাত (آخرة)

আখিরাত হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। বাংলা ভাষায় একে পরকাল বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের যে নতুন জীবন শুরু হয় তা-ই পরকাল বা আখিরাত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটি অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবন।

আখিরাত বা পরকালের দুটি পর্যায় রয়েছে। যথা-

ক. বারযাখ

খ. কিয়ামত।

### বারযাখ

দুটি বক্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়কে বারযাখ বলে। মানুষের মৃত্যু থেকে কিয়ামত বা পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে বারযাখ বলে। এটি কিয়ামত ও দুনিয়ার জীবনের মধ্যবর্তী পর্দা স্বরূপ। মানুষের মৃত্যুর পর এ জীবনের শুরু হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَرَزَ خَالِيَّوْمٍ يُبَعَثُونَ ○

অর্থ : “আর তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ যা পুনরুত্থান পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।” (সূরা আল-মু’মিনুন, আয়াত: ১০০)

বারযাখ হলো কবরের জীবন। এটি আখিরাতের সর্বপ্রথম পর্যায়। বারযাখ জীবনে মানুষ দুনিয়ার ভালো আমলের কারণে শান্তি ভোগ করবে আর খারাপ আমলের জন্য শান্তি ভোগ করবে।

## কিয়ামত

কিয়ামত অর্থ দণ্ডয়ান হওয়া, উঠা। ইসলামি পরিভাষায় কবর থেকে মানুষ উঠে সেদিন আল্লাহর সামনে দণ্ডয়ান হবে, তাই একে বলা হয় কিয়ামত। কিয়ামতে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। এরপর নেককারদের জাহানে এবং পাপীদের জাহানামে প্রবেশ করানো হবে।

### গুরুত্ব

আধিরাত আকাইদের অন্যতম গুরুত্পূর্ণ বিষয়। আধিরাতের প্রতি ইমান আনা অপরিহার্য। আধিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না। মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبِالْأُخْرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  
○

অর্থ : “আর তাঁরা (মুন্তাকিগণ) আধিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪)

আধিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল করে তোলে। এর ফলে মানুষ উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার গুণাবলি অনুশীলন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرٌةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ  
○

অর্থ : “আর যারা আধিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী।” (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ২২)

আধিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে। ফলে যেকোনো উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করতে চায়। অন্যায়, অত্যাচার, অনেতিক কার্যকলাপ সবকিছুই তার দ্বারা সংঘটিত হয়। যেকোনো পাপ করতে সে দ্বিদ্বারাধ করে না। আধিরাতে বিশ্বাস মানুষকে একপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং পরিত্র করে তোলে।

সুতরাং আমরা আধিরাতে বিশ্বাস করব এবং নৈতিক ও পৃত-পরিত্র জীবনযাপন করব।

কাজ : এই পাঠ শেষে আধিরাত সম্পর্কে শিক্ষার্থী যা শিখল তা লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ৭

### শাফাআত (آلشَّفَاعَةُ)

শাফাআত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। কিয়ামতের দিন শাফাআত সাধারণত দুটি কারণে করা হবে।

যথা-

- ক. পাপীদের ক্ষমা ও পাপ মার্জনার জন্য
- খ. পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভের জন্য।

### তাৎপর্য

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের সব কাজকর্মের হিসাব লেবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য জাল্লাত বা জাহানাম নির্ধারণ করবেন। এ সময় পুণ্যবানগণ জাল্লাত লাভ ও পাপীরা জাহানাম ভোগ করবে। নবি-রাসূল ও পুণ্যবান বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন। ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে। এরপর তাদেরকে জাহানাম থেকে জাল্লাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

আবার অনেক পুণ্যবানের জন্যও এদিন শাফাআত করা হবে। ফলে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

শাফাআতে সাধারণত দুই প্রকার। যথা-

- ক. শাফাআতে কুবরা
- খ. শাফাআতে সুগরা

### শাফাআতে কুবরা

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে। সেদিন সূর্য খুব নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপত্তি থাকবে। এ সময় তারা হ্যরত আদম (আ.), হ্যরত নূহ (আ.), হ্যরত ইবরাহিম (আ.), হ্যরত মুসা (আ.) ও হ্যরত ঈসা (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআত করতে অনুরোধ করবে। তাঁরা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করবেন। এ সময় সকল মানুষ মহানবি (স.)-এর নিকট উপস্থিত হবে। তখন মহানবি (স.) আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হিসাব-নিকাশ শুরু করবেন। এ শাফাআতকে বলা হয় শাফাআতে কুবরা। একে শাফাআতে উয়মাও (সর্বশ্রেষ্ঠ শাফাআত) বলা হয়। এরপর শাফাআতের অধিকার একমাত্র মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর থাকবে। এ ছাড়া নবি করিম (স.)- জাল্লাতিগণকে জাল্লাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবেন। এর পরই কেবল জাল্লাতিগণ জাল্লাতে প্রবেশ করতে পারবে।

### শাফাআতে সুগরা

কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। এটাই হলো শাফাআতে সুগরা। নবি-রাসূল, ফেরেশতা, শহিদ, আলিম, হাফিজ এ শাফাআতের সুযোগ পাবেন। আল কুরআন ও সিয়াম (রোয়া) কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত বিষয়ে শাফাআতে সুগরা করা হবে।

১. যেসব মুমিন পাপের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হবে তাদের মাফ করে জাহান্নামে দেয়ার জন্য শাফাআত।
২. যেসব মুমিন পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদের জাহান্নামের শান্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য শাফাআত।
৩. জাহান্তিগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য শাফাআত।

আমরা শাফাআতে বিশ্বাস স্থাপন করব। আল্লাহকে ভালোবাসব, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ অনুযায়ী চলব। ফলে পরকালে প্রিয়নবি (স.)-এর শাফায়াত লাভ করে জাহান্নামে যাব।

কিয়ামতের দিন নবি-রাসূল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা এসব শাফাআত করুল করবেন এবং বহু মানুষকে জাহান্নামে দান করবেন। তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর অধিকারে। তিনি নিজেই বলেছেন-

### أُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ

অর্থ : “আমাকে শাফাআত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।” (বুখারি ও মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- পৃথিবীতে কত ইট ও পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত করব। (মুসনাদ আহমদ)

শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত। মহানবি (স.)-এর শাফাআত ব্যক্তিত কিয়ামতের দিন সফলতা, কল্যাণ ও জাহান্নামে লাভ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং আমরা প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর শাফাআতে বিশ্বাস করব। তাকে ভালোবাসব ও পূর্ণরূপে অনুসরণ করব। তাহলে আমরা তাঁর শাফাআত লাভে সক্ষম হব।

**কাজ :** শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হবে। এবার একদল শাফাআতের পরিচয় ও তাৎপর্য বলবে এবং অন্যদল প্রকারভেদ বর্ণনা করবে।

## পাঠ ৮

### জাহান্নাম (جَهَنَّمُ)

জাহান্নাম শব্দের অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান। ফারসি ভাষায় একে বলা হয় বেহেশত। বাংলায় একে বলা হয় স্বর্গ। ইসলামি পরিভাষায় অখিরাতে ইমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চিরশান্তির আবাসস্থল তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে জাহান্নাম বলা হয়।

জান্নাত হলো চিরশাস্তির স্থান। সেখানে সবকিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তু দারা সুসজ্জিত। জান্নাতের ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্রসহ সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত। জান্নাতে থাকবে রেশমের গালিচা, দুধ ও মধুর নহর। মিষ্টিপানির স্রোতধারা। বস্তুত আনন্দ উপভোগের সব রকমের জিনিসই জান্নাতে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَاءُونَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

অর্থ: “আর সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই তোমাদের জন্য রয়েছে আর তোমরা যা দাবি করবে তাও তোমাদের দেওয়া হবে।” (সূরা হা-যীম আস্ সাজদাহ, আয়াত: ৩১)

জান্নাতের বিবরণ দিয়ে রাসূল (স.) বলেন- “আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ‘আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চোখ কোনোদিন দেখেনি, কোনো কান কোনোদিন শোনেনি, আর মানুষের অঙ্গরও যা কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি।’” (বুখারি)

### জান্নাতের নাম

জান্নাত মোট আটটি। এগুলো হলো-

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| ১. জান্নাতুল ফিরদাউস | ৫. দারুল নাইম    |
| ২. জান্নাতুল মাওয়া  | ৬. দারুল খুলদ    |
| ৩. দারুল মাকাম       | ৭. দারুস সালাম   |
| ৪. দারুল কারার       | ৮. জান্নাতু আদন। |

এ আটটি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

### জান্নাত লাভের আমল ও উপায়

জান্নাত হলো মুমিনদের ও পুণ্যবানদের বাসস্থান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

অর্থ: “আর (হে নবি!) যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫)

সুতরাং জান্নাত লাভের জন্য দুনিয়াতে সর্বপ্রথম ইমান আনতে হবে। আকাইদের সব বিষয়ের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। অতঃপর নেক কাজ করতে হবে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে।

মহানবি (সা.) বলেছেন-

## مِفتَاحُ الْجَنَّةِ الْصَّلَاةُ -

অর্থ : সালাত হলো জান্নাতের চাবি। (তিরমিয়ি)

নামায়ের পাশাপাশি রমযানের রোয়া পালন, যাকাত আদায় ও হজ করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য সৎকাজ, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার অনুশীলন করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

অর্থ : “আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে এবং নিজকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, নিঃসন্দেহে জান্নাতেই হবে তার আবাসস্থল।” (সূরা আল-নাফিআত, আয়াত: ৪০-৪১)

সুতরাং আমরা সব সময় নেক আমল করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ অমান্য করব না। তাহলেই আমরা আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে পারব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা-

- ক. জান্নাতের নামগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।
- খ. জান্নাত লাভের উপায় সম্পর্কে ৫টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ৯

### জাহানাম (জেহেম)

জাহানাম হলো আগন্তের গর্ত, শান্তির স্থান। একে দোষথ বা নরকও বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় আখিরাতে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের শান্তির জন্য যে স্থান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে তাকে জাহানাম বলা হয়।

জাহানাম খুবই ভয়ংকর স্থান। সেখানে রয়েছে যত্নগাদায়ক শান্তি। সেখানে পাপীরা আগন্তে দঞ্চ হবে। বড় বড় সাপ, বিচ্ছু, কীটপতঙ্গ মানুষকে দৎশন করবে। জাহানামের আগন হবে আমাদের দুনিয়ার আগন থেকে স্তর গুণ বেশি উন্নত। জাহানামিদের খাদ্য হবে যাকুম নামক বড় বড় কঁটাযুক্ত বৃক্ষ। যা তারা খেতে পারবে না, বরং গলায় আটকে যাবে। তাদের পানীয় হবে দোষথিদের উন্নত রক্ত ও পুঁজ। সেখানে মানুষের কোনো মৃত্যু হবে না, বরং শান্তি পেতে থাকবে এবং চিরকাল ধরে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।

জাহানামের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِنَا سُوفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۚ كُلَّمَا نَضْجَعُتْ جُلُودُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا  
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۖ

অর্থ : “যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে অট্টিরেই আমি তাদেরকে (জাহানামের) আগনে প্রবেশ করাব। সেখানে যখনই তাদের চামড়া জলে যাবে তখনই এর স্তুল নতুন চামড়া সৃষ্টি করব, যাতে তারা শান্তি ভোগ করতে পারে।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৬)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعُتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ يُصْهَرُ بِهِ  
مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَلُودُ ۝ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيبٍ ۝ كُلَّمَا آتَاهُمْ أَدْوَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ۝  
أُعِيدُونَ فِيهَا ۝ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

অর্থ : “যারা কুফুরি করে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগনের পোশাক। তাদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে ফট্টন্ট পানি। এর দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুণ্ড। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহানাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদের পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে- স্বাদ গ্রহণ কর দহন-যন্ত্রণার।” (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ১৯-২২)

### জাহানামের নাম

জাহানাম মোট সাতটি। এগুলো হলো-

১. জাহানাম    ২. হাবিয়া    ৩. জাহিম    ৪. সাকার    ৫. সাইর    ৬. হৃতামাহ    ৭. লায়া।

### জাহানাম থেকে পরিত্রাণের উপায়

আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুলের প্রতি যারা ইমান আনে না তারাই জাহানামের অধিবাসী। তাছাড়া যেসব লোক দুনিয়ায় অন্যায় ও পাপ কাজ করবে তারাও জাহানামের শান্তি ভোগ করবে। অশ্লীল ও অনৈতিক কাজ করলেও জাহানামের শান্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং আমরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকব। আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করব। তাহলে জাহানামের কঠিন শান্তি থেকে রেহাই পাব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা-

- ক. জাহানামের নামগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।
- খ. জাহানামের পরিচয় এবং জাহানাম থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

## পাঠ ১০

### ইমান ও নেতৃত্ব

ইমান হলো বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইমান বলা হয়। যে ব্যক্তি ইমান আনে তাকে বলা হয় মুমিন। আর নেতৃত্ব হলো নীতিসমূহীয়, নীতিমূলক কাজে-কর্মে, কথাবার্তায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণই হলো নেতৃত্ব।

ইমান ও নেতৃত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নেতৃত্বের অনুসরণ করা মুমিন ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব। নীতি-নেতৃত্ব না মানলে কোনো ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারে না। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, শক্তি, পরম্পর সহযোগিতা, সাম্য-মেট্রী, ভাড়ত্ব ইত্যাদি সৎগুণ ইমানদার ব্যক্তির থাকা প্রয়োজন। এগুলো নেতৃত্বের প্রধান দিকসমূহের অন্যতম। মুমিন ব্যক্তি এসব গুণ চর্চা করে থাকেন। অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি অনেতৃত্বের কাজ থেকে মুমিন ব্যক্তি দূরে থাকেন। ইমানের শিক্ষা মুমিনকে এসব কাজ থেকে ছেফাজত করে। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

মানুষ যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না। (বুখারি ও মুসলিম)

অতএব বোকা গেল, মুমিন ব্যক্তি কোনোরূপ অনেতৃত্বের কাজ করতে পারে না।

ইমানের মূলকথা হলো- **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ)

অর্থ : “আল্লাহ ব্যক্তিত কোনো মাঝে নেই। মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল।”

এ কালিমার সারকথা হলো ইবাদত ও প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। আর আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স.)- এর দেখানো পথ ও আদর্শই হলো প্রকৃত মুক্তি ও সফলতার পথ। দুনিয়ার সর্বাবস্থায় সকল কাজে এ কালিমা মনে রাখতে হবে। এ কালিমার শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করতে হবে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা এরপরই করে থাকেন।

আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুলের আদর্শই হলো নেতৃত্বের আদর্শ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নীতি ও আদর্শ অনুসরণের জন্য বহু নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর রাসুল (স.) নিজে ছিলেন উচ্চ আদর্শের বাস্তব নমুনা। তিনি হাতে-কলমে মানুষকে নেতৃত্ব ও উচ্চ চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। মুমিন ব্যক্তি জীবনযাপনের ফেত্তে ইমানের এ শিক্ষা বাস্তবায়ন করে থাকেন।

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, ইমান ও নেতৃত্ব খুবই গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইমান মানুষকে নীতি নেতৃত্বের পথ দেখায়। ইমান অনেতৃত্ব ও অশ্লীল কার্যাবলি থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আমাদেরও উচিত ইমানের শিক্ষা গ্রহণ করা। অতঃপর নিজ জীবনে তার বাস্তবায়ন করা। তাহলে আমরা নেতৃত্বের অনুসারী হয়ে

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারব। ফলে আমাদের দুনিয়ার জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে। আর পরকালীন জীবনে আমরা লাভ করব মুক্তি, সফলতা ও চিরশান্তির জাহাত।

**কাজ :** শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দু'দলে ভাগ হয়ে যাবে। এবার প্রত্যেক দল থেকে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবে। “প্রকৃত ইমানই কেবল মানুষকে নীতি-নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে” বিষয়ের পক্ষে একদল এবং বিপক্ষে একদল অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করবে। শ্রেণিশিক্ষক সঞ্চালক হিসেবে থাকবেন।

বিতর্ক শেষে বিজয়ী দলকে এবং উভয় দলের মধ্যে যে বক্তা বিতর্কে যুক্তিপূর্ণ ভালো বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, তাকে সবাই মিলে ধন্যবাদ জানাবে। সম্ভব হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে।

## অনুশীলনী

### শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই —— বলা হয়।
২. ইমানের —— দিক রয়েছে।
৩. আসমানি কিতাব সর্বমোট —— খানা।
৪. আল্লাহ মুহাইমিনুন অর্থ ——।
৫. শাফাআত সাধারণত —— প্রকার।

### বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. শাফাআত একটি	পরকাল
২. ইমান আল্লাহর একটি	বড় নিয়ামত
৩. মুনাফিকরা নিশ্চয়ই	বিরাট নিয়ামত
৪. আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা	অপরিসীম
৫. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলে	মিথ্যাবাদী

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাসের প্রয়োজন কেন?
২. নিফাক বলতে কী বোঝায়?
৩. শাফাআত বলতে কী বোঝায়?

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ইমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
২. রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৩. নেতৃত্ব চরিত্র গঠনে ইমানের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমানের মৌলিক বিষয় কয়টি?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. তিনটি | খ. পাঁচটি |
| গ. সাতটি | ঘ. আটটি   |

২. নিফাকের ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়-

- i. অশান্তি
  - ii. ঝগড়া বিবাদ
  - iii. মৈতেক্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সানিয়াত একটি অফিসে চাকুরি করেন। তিনি সঠিক সময়ে অফিসে আসেন এবং তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি কোনো অন্যায় ও অনেতৃত্ব কাজ করেন না। তিনি দুনিয়াকে সবকিছু বলে মনে করেন না।

৩. সানিয়াতের কর্মকাণ্ডের পিছনে কোন বিশ্বাসটি কাজ করেছে?

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. তাকদির  | খ. আধিরাত |
| গ. রিসালাত | ঘ. শাফাআত |

৪. সানিয়াতের কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ প্রাপ্য হবে-

- i. প্রশংসা
- ii. জান্মাত
- iii. নবির শাফাআত

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

## সূজনশীল প্রশ্ন

১। জায়েদ ও নয়ন সহপাঠী। জায়েদ আল্লাহ, রাসুল, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদির, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্মৃতির করে। সে তার বিশ্বাস অনুসারে আমল করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করে। অন্যদিকে নয়ন জায়েদের সাথে থাকাকালীন সালাত আদায় করে; ইমানদারসুলভ আচরণ করে। কিন্তু তার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধুদের সাথে থাকাকালীন তাদেরকে বলে, আমি তোদের ধর্মকেই বিশ্বাস করি। জায়েদের সাথে সালাত আদায় করি ওকে খুশি করার জন্য। তবে সে এটাও তাবে যে, এজন্য তার কঠোর শাস্তি হতে পারে।

ক. তাকদির অর্থ কী?

খ. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. জায়েদের কর্মকাণ্ডকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “নয়নের কর্মকাণ্ডের পরিণতি নিশ্চয়ই খারাপ”- বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

২. সুমাইয়া ও সামিয়া দুই বাঙ্কী। সোনারগাঁয়ে বেড়াতে যাবে বলে দুজনেই দিন-তারিখ ঠিক করে। সুমাইয়া নির্দিষ্ট তারিখে প্রস্তুতি নিয়ে সামিয়ার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু সামিয়া তার বাবার কাছ থেকে টিফিন, কাগজ ও কলমের অজুহাত দিয়ে বেশ কিছু টাকা নিয়ে আদিবার সাথে মার্কেটে ঘুরতে চলে যায়। পরদিন সামিয়ার সাথে সুমাইয়ার দেখা হয়। সুমাইয়া বিষয়টি উত্থাপন করলে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং উভয়ই মনঃক্ষুঢ় হয়।

ক. মুনাফিকের চিহ্ন কয়টি?

খ. তাকদিরে বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়?

গ. সামিয়ার আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুমাইয়ার কার্যক্রমের ফলাফল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### ইবাদত (الْعِبَادَةُ)

আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে তার আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করে জীবন পরিচালনাকে ইসলামি পরিভাষায় ইবাদত বলে। ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয় যথা : কালিমা, নামায, রোয়া, যাকাত ও হজ যথাযথ পালনের নাম ইবাদত। আবার মানব-জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধি-বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করাও ইবাদতের অঙ্গভূক্ত। পৃথিবীর সকল সৃষ্টিবস্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- যাকাতের ধারণা, যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত ও যাকাতের মাসারিফ বর্ণনা করতে পারব।
- যাকাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হজের ধারণা, পটভূমি, তাৎপর্য, ফজিলত, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতসমূহ ও নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- হজ পালনের ত্রুটি এবং তা সংশোধনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- সাম্য ও বিশ্বভাত্ত প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কুরবানির ধারণা, পটভূমি ও নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে ত্যাগ ও উদারতা অর্জনে কুরবানির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আকিকার ধারণা ও আদায়ের নিয়ম বর্ণনা করতে পারব।

#### পাঠ ১

### যাকাত (الزكوة)

'যাকাত' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ধনী ব্যক্তিদের নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ সম্পদ থাকলে নির্দিষ্ট অংশ গরিব ও অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াকে যাকাত বলে।

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তিবিশেষের হাতে পুঁজীভূত থাকে না। আর মানুষের হাতে সম্পদ পুঁজীভূত থাকুক আল্লাহ তায়ালা তা পছন্দ করেন না। তিনি চান সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয় হোক, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হোক। এ বিবেচনায় যাকাত অর্থ বৃদ্ধি। যাকাত প্রদানে দাতার অন্তর কৃপণতার কলৃষ থেকে পবিত্র হয়। বিন্দুশালীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার আছে। কাজেই গরিবের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দিলে অবশিষ্ট সম্পদ ধনীদের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। এদিক বিবেচনায় যাকাত অর্থ পবিত্রতা। যাকাত দিলে সম্পদে আল্লাহ বরকত দান করেন।

ইসলামের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রূকনের মধ্যে যাকাত অন্যতম। কুরআন মজিদের বহু জায়গায় সালাতের সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

**وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكُوَةَ**

অর্থ: “আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।” (সূরা আল-মুয়াম্রিল, আয়াত: ২০)

যাকাত হলো দরিদ্রের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। ধনীদের দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং এটি আদায় করা ধনীদের উপর ফরজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

**وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلصَّالِحِينَ وَالْمُحْرُومِ**

অর্থ: “আর তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে অবশ্যই অভাবহস্ত ও বধিতদের অধিকার রয়েছে।”

(সূরা আয়-যারিয়াত, আয়াত: ১৯)

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নামায আদায় করলে, আদায়কারীর জন্য যেমন পুরস্কারের ঘোষণা আছে, তেমনি যাকাত (ফরজ হলে) আদায়কারীর জন্যও সুসংবাদ রয়েছে। যেমন, যাকাত দিলে মাল পুরিত্ব হয় এবং সম্পদে আল্লাহ তায়ালা বরকত দেন। যাকাত প্রদানকারীদের আখিরাতে অধিক পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হবে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবেনা। হাদিসে কুদসিতে আছে, “আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে বলেন, হে বনি আদম! আমার পথে খরচ করতে থাক। আমি আমার অফুরন্ত ভাগ্নার থেকে তোমাদের দিতে থাকব” (বুখারি ও মুসলিম)।

যাকাত আদায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

**وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعْكُمْ طَلَئِنْ أَفْتَمْ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكُوَةَ**

অর্থ : “আর আল্লাহ বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ১২)

যাকাত দানকারীর পুরস্কার ও কৃপণ ব্যক্তির দুঃসংবাদ সম্পর্কে অন্য এক হাদিসে আছে, “দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জাল্লাতের নিকটবর্তী, আল্লাহর বান্দাদের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। অপরদিকে কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাদের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে। একজন জাহিল দানশীল একজন কৃপণ আবিদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি পছন্দনীয়।” (তিরমিয়ি)

কেউ যদি সম্পদ জমা করে রাখে দরিদ্র ও বধিতদের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে: আর যারা সোনা রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উক্তগুণ করা হবে এবং তা দিয়ে কপালে, পাঁজরে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে, সেদিন বলা হবে এ তো সে সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। এখন সে সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর। (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫)

যাকাত ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যারা তা আদায় করে না এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে ইসলামি বিধান হচ্ছে, পার্থিব জীবনে তারা কৃপণ হিসেবে আখ্যায়িত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন : “আর ধৰংস ঐসব মুশ্রিকের জন্য, যারা যাকাত দেয় না ও আখ্রিাতকে অস্বীকার করে।” (সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ, আয়াত: ৬-৭)

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করল। খলিফা তাদের ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমতুল্য মনে করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, মহানবি (স.)-এর যুগে যারা যাকাত দিত, তাদের মধ্যে কেউ যদি একটি ছাগলের বাচ্চা দিতেও অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বক্তব্যের যৌক্তিকতার সাথে নিম্নবর্ণিত হাদিসের বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। হাদিসে আছে, “আল্লাহর কসম, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য স্থিত করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব।” (বুখারি)

প্রত্যেক মুমিন বান্দার উচিত পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় যথানিয়মে যাকাত আদায় করা। অন্যকে যাকাত দানে উৎসাহিত করা। ইসলামি বিধানমতো যাকাত আদায় করে সমাজের অসহায় দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি করা।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাকাত প্রদানের সুফল সম্পর্কে আলোচনা করবে।

## পাঠ ২

### যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত ( شرائط فرضية الْزكوة )

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত সাতটি। শর্তগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১. মুসলমান হওয়া : যাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মুসলমান হওয়া। অমুসলিমদের উপর যাকাত ফরজ নয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার অতীত জীবনের যাকাত দিতে হবে না। যেদিন মুসলমান হবে সেদিন থেকে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।
২. নিসাবের মালিক হওয়া : যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে শরিয়তে যাকাত ফরজ হয়, সে পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া।
৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া : যেসব দ্রব্যের উপর মানুষের জীবনযাপন নির্ভর করে, সেসব জিনিসপত্রকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে। যেমন : খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বসবাসের বাড়িঘর, পেশাজীবীর যত্নপাতি ইত্যাদি। যানবাহনের নৌকা, সাইকেল, মোটর, পশু, কৃষিকাজের সরঞ্জাম, পড়ালেখার সরঞ্জাম এসবও প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর উপর যাকাত ফরজ হবে না।
৪. ঝণগ্রস্ত না হওয়া : ঝণগ্রস্ত ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তার উপর যাকাত ফরজ হবে না। কারণ সে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনেই ঝণ গ্রহণ করেছে। তবে ঝণ পরিশোধ করার পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ কারো হাতে থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

৫. মাল এক বছরকাল স্থায়ী থাকা : নিসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তির হাতে এক বছর কাল স্থায়ী না হলে, তার উপর যাকাত ফরজ হয় না। হাদিসে আছে, “ঐ সম্পদে যাকাত নেই যা পূর্ণ এক বছর মালিকানায় না থাকে।” (ইবনু মাজাহ)
৬. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া : যাকাত ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। জ্ঞানবুদ্ধিহীন তথা পাগলের উপর যাকাত ফরজ নয়।
৭. বালেগ হওয়া : যাকাতদাতাকে অবশ্যই বালেগ তথা প্রাণবয়স্ক হতে হবে। শিশু, নাবালেগ যত সম্পদের মালিকই হোক না কেন, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার উপর যাকাত ফরজ হয় না।

### যাকাতের নিসাব (نِصَابُ الرِّزْقِ)

‘নিসাব’ আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ। শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলে। সারাবছর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে যার হাতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ উদ্ধৃত থাকে তাকে বলা হয় সাহিবে নিসাব বা নিসাবের মালিক। আর সাহিবে নিসাবের উপরই যাকাত ফরজ। নিসাবের পরিমাণ হলো, সোনা কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা অথবা বুপা কমপক্ষে সাড়ে বায়ান তোলা অথবা ঐ মূল্যের অর্থ বা সম্পদ। ঐ পরিমাণ সম্পদ কারো নিকট পূর্ণ এক বছরকাল স্থায়ী থাকলে ঐ সোনা, বুপা বা সম্পদের মূল্যের চাপ্পিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দেওয়া ফরজ। কিন্তু সম্পদ নিসাবের কম থাকলে যাকাত দেওয়া ফরজ নয়। এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে না। কারো হাতে যদি বছরের প্রথমে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, বছরের মাঝে কোনো কারণে নিসাব হতে কমে যায় এবং বছর শেষে আবার নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে গেলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

স্তীলোকের ব্যবহার্য সোনা, বুপার অলংকার জীবনের আবশ্যিকীয় মৌলিক বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই অলংকার নিসাব পরিমাণ হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। সোনা, বুপা ব্যতীত অন্য কোনো ধাতু যথা: তামা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিস হিসাবে থাকলে যাকাত দিতে হবে না। তবে ব্যবসায়ের সামগ্ৰী হলে যাকাত দিতে হবে। এর জন্য শর্ত হচ্ছে এসব সামগ্ৰী এক বছরকাল হাতে স্থায়ী থাকা এবং নিসাব পরিমাণ হওয়া।

### উৎপন্ন শস্যের যাকাত

ধান, গম, ঘৰ, খেজুর ইত্যাদি শস্য সেচ প্রদান ছাড়া বৃষ্টির পানিতে জন্মালে উৎপাদিত সব ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। একে উশর বলা হয়। আর সেচ ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাকাতের নিসাব সম্পর্কে আলোচনা করবে।

### পাঠ ৩

## যাকাতের মাসারিফ (مصارف الزكوة)

মাসারিফ আরবি শব্দ। এর অর্থ ব্যয় করার খাত। শরিয়তের পরিভাষায় ইসলামি বিধান অনুযায়ী যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায়, তাদেরকে বলা হয় যাকাতের মাসারিফ। যাকাতের মাসারিফ অর্থাৎ কোন কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে: “যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিন্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, খাণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য, ইহা আল্লাহর বিধান।” (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬০)

### যাকাতের মাসারিফ আটটি

১. অভাবগ্রস্ত বা ফকির।
২. সম্মতীন, মিসকিন।
৩. যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ।
৪. মন জয় করার উদ্দেশ্যে।
৫. মুক্তিকামী দাস।
৬. খণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তি।
৭. আল্লাহর পথে।
৮. মুসাফির বা অসহায় প্রবাসী পথিক।

### নিচে মাসারিফের বিবরণ দেওয়া হলো-

১. অভাবগ্রস্ত বা ফকির : ফকিরকে বাংলায় গরিব বলা হয়। যাদের কিছু না কিছু সম্পদ আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। যাদের জীবনধারণের জন্য অপরের সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হয়, এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যায়। জীবিকা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি, পঙ্ক, ইয়াতিম শিশু, বিধবা, স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল এবং যারা দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শিকার এমন লোকদের সাময়িকভাবে যাকাতের খাত থেকে সাহায্য করা যায়।
২. মিসকিন : যারা নিঃস্ব, নিজের পেটের অন্ত যোগাড় করতে পারে না এবং অভাবগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও সম্মানের ভয়ে কারো দ্বারা দ্বারং হয় না, তাদের মিসকিন বলে। মিসকিন সম্পর্কে হাদিসে আছে, “যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদ পায় না, অর্থাৎ আত্মসম্মানের ভয়ে সে এমনভাবে চলে যে, তাকে

অভাবী বলে বোঝাও যায় না, যাতে লোকেরা তাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। আর সে সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাতও পাতে না, কিছু চায়ও না।” (বুখারি ও মুসলিম)। মিসকিনকে যাকাত দেওয়া যায়।

৩. যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ : রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে যারা যাকাত আদায় করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, বন্টন করে ও হিসাবপত্র রাখে, তাদের যাকাতের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী বলে। তারা আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন হলেও যাকাত থেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে।
৪. মন জয় করার উদ্দেশ্যে : সদ্য মুসলমান হওয়া ব্যক্তির সমস্যা দূরীকরণে এবং ইসলামের উপর অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে তাদের যাকাত দেওয়া যাবে। ইসলামি পরিভাষায় তাদের ‘মুআল্লাফাতুলকুলুব’ বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ জাতীয় লোককে যাকাত দেওয়ার বিধান ছিল। দরিদ্র হলে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।
৫. মুক্তিকামী দাস : যে দাস তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে মুক্তি পাওয়ার চুক্তি করেছে এমন দাসকে মূল্য পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করা যেতে পারে। বর্তমানে ক্রীতদাস প্রথা চালু নেই বিধায় এ খাতে যাকাতের অর্থ বন্টন করা হয় না।
৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি : যে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম, তাদের যাকাত দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে সাহায্য করা যায়।
৭. আল্লাহর পথে : এর আরবি পরিভাষা হলো ‘ফি সাবিলিল্লাহ’। ফি সাবিলিল্লাহ বলতে আল্লাহর পথে খরচ করাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর পথে যে সকল কাজ, সে সকল খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। আল্লাহর পথে জিহাদকারী সেসব মুজাহিদ যাদের অক্ত ও জিহাদের উপকরণ ত্রয় করার ক্ষমতা নেই, তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে। দীনী ইলম শিক্ষার্থী কিংবা অন্যান্য সৎকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে, যদি তারা গরীব হয়।
৮. অসহায় প্রবাসী পথিক : কোনো ব্যক্তি সফরে গিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়লে বা যাত্রাপথে আর্থিক সংকটের কারণে বিপদে পড়লে সাময়িকভাবে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে ‘যাকাতের মাসারিফ’-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

## পাঠ ৪

### যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত থাকলে, সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হবে। আবার ধনীরাও তাদের দায়মুক্ত হওয়ার বিশেষ সুযোগ পাবে। কাজেই ইসলামে যাকাতের

অনেক গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নে যাকাতের কতিপয় গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

### ১. যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

যাকাতের অন্যতম গুরুত্ব হলো অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। সমাজের কেউ সম্পদের পাহাড় গড়বে, সুউচ্চ ইমারতে বসবাস করবে, বিলাসবহুল জীবনযাপন করবে, আর কেউ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাবে এমন বিধান ইসলামে নেই। কেউ শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে না, আর বাড়ি বাড়ি ঘূরবে, শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করে না। কাজেই সকল শ্রেণির নাগরিকের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইসলাম ধনীদের উপর যাকাত ফরজ করেছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “আল্লাহ তায়ালা লোকের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরজ করেছেন। তা নেওয়া হবে ধনীদের থেকে এবং বিলিয়ে দেওয়া হবে দুষ্টদের মধ্যে।” (বুখারি ও মুসলিম)

সাধারণত মানুষের অর্থের প্রতি লিঙ্গ থাকে। যে কৃপণ স্বভাবের হয়, সে নিজের কষ্টে উপর্যুক্ত অর্থ নিঃস্বার্থভাবে কাউকে দিতে চায় না। তাই দয়াময় আল্লাহ তায়ালা সম্পদশালী ব্যক্তিদের মনকে সম্পদের লিঙ্গ, লোভ, কৃপণতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষের মনকে দয়া-মায়া, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণসম্পন্ন করে তোলার জন্য তাদের উপর যাকাত ফরজ করে দিয়েছেন।

সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তায়ালা। মানুষের নিকট তা আমানতস্কর্প। মানুষ শ্রম ও মেধার দ্বারা সম্পদ অর্জন করবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদ খরচ করবে। কিন্তু সম্পদ জমা করে রাখা বা কেবল নিজের ভোগবিলাসের জন্য খরচ করা ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ ধনীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার আছে, তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। গরিবের অধিকার আদায় করলে মালিক দায়মুক্ত হবে, সম্পদ পবিত্র হবে; অন্যথায় সম্পদ হালাল হবে না। ইসলামি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ সমর্থন করা হয় না। যাকাত প্রথার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

হয়রত মুহাম্মদ (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করা হতো। আদায়কৃত মালের বিতরণও সরকারি ব্যবস্থাপনায় হতো। নিসাবের নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের মালিকরা যাকাত দিতে বাধ্য থাকত। অন্যদিকে যারা যাকাত পাওয়ার হকদার (দাবিদার) তারা সবাই যাকাতের অর্থ পেয়ে উপকৃত হতো।

কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মোতাবেক যাকাত আদায় ও বিতরণ করা মুসলমানদের একটি পবিত্র দায়িত্ব। এ ব্যবস্থাপনার উপর মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমে আসবে; কেউ বেকার থাকবে না। বরং মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। অসহায় গরিব মানুষকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা একটি মানবিক দায়িত্ব। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে এ মানবিক গুণের বিকাশ ঘটবে।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে ‘যাকাতের অর্থনৈতিক’ গুরুত্বের উপর আলোচনা করবে।

## ২. যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব

যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূর হয়। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আল্লাহর নির্দেশমতো যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করলে সমাজের কোনো লোক অগ্রহীন, বন্ধুহীন, গৃহহীন থাকবে না। কেউ না খেয়ে থাকবে না। কেউ বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না।

সম্পদশালী ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাকাত ও সাদাকার (দানের) অর্থে অভাবীদের প্রয়োজন মিটিয়েও অনেক জনহিতকর এবং কল্যাণমূলক কাজ করা যায়। বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। স্বাস্থ্যবান দরিদ্র শ্রমিককে তার শ্রমের উপযোগী উপকরণ দেওয়া সম্ভব হয়। দরিদ্রের জন্য সেবামূলক অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন ইয়াতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করা যায়। এমনিভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে এমন এক সময় আসবে যখন যাকাত গ্রহণ করার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামের প্রথম যুগে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ খলিফা হযরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজ (র.)-এর যুগের কথা উল্লেখ করা যায়। ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে, তাঁর যুগে যাকাত নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা গোটা সমাজকে ক্ষণগতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদেশ প্রভৃতি বদ্ধভ্যাস থেকে পৰিত্র রাখে এবং পরম্পরের মধ্যে ভালোবাসা, ত্যাগ, মমত্ববোধ ইত্যাদি গুণ আরও সুদৃঢ় করে।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে ‘যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব’-এর উপর আলোচনা করবে।

## পাঠ ৫

### হজ (ক্ষেত্র)

‘হজ’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় নির্দিষ্ট দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সৎশিল্প স্থানসমূহে বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ বলে। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। যিনহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত মক্কা, মিনা, আরাফা এবং মুয়দালিফায় আল্লাহ ও তার রাসূল (স.)-এর নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করাও হজের অঙ্গভূক্ত। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাণবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নরনারীর উপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ফরজ। এরপর যতবার হজ করবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে এবং অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবে। হজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

“মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য।” (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৯৭)

যেসব লোক কাবাঘর পর্যন্ত যাতায়াতের দৈহিক ক্ষমতা রাখে এবং হজ হতে ফিরে আসা অবধি পরিবারবর্গের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম, তাদের উপর হজ ফরজ। মহিলা হাজি হলে একজন সঙ্গী থাকতে হবে। সঙ্গী হবেন স্বামী অথবা এমন আত্মীয় যার সাথে বিবাহ সম্পর্ক হারাম। যেমন: বাবা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা ইত্যাদি। সফরসঙ্গীর ব্যয়ভার মহিলা হাজিকেই বহন করতে হবে।

### হজের ঐতিহাসিক পটভূমি

ইসলামের পাঁচটি স্তুপের মধ্যে সালাত অন্যতম। সালাত আদায় ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্য পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মক্কা নগরীতে যে ঘর (ইবাদতখানা) তৈরি হয়, তার নাম ‘বাইতুল্লাহ’ বা আল্লাহর ঘর। কালক্রমে এ পবিত্র ঘর জনমানবশূল্য হয়ে পড়ে।

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ইরাকে জন্ম নেওয়া আল্লাহর নবি হ্যরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশে বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কাবাঘরের নিকটবর্তী জনমানবশূল্য স্থানে রেখে যান। বিবি হাজেরা স্বামীকে লক্ষ করে বললেন : “আমাদের এমন মরু প্রান্তরে ফেলে রেখে কেন চলে যান?” উত্তরে স্বামী বললেন, “আল্লাহর নির্দেশ।” বিবি হাজেরা বললেন, “তাহলে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তিনি অবশ্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন।” যাওয়ার সময় হ্যরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁদের জন্য দোয়া করলেন।

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুম কিন্তু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও যেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।” (সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৩৭)

নবি ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রার্থনা আল্লাহ তায়ালা কবুল করলেন।

হ্যরত ইব্রাহিম (আ.)-এর রেখে যাওয়া সামান্য খাদ্য ও পানীয় কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। মা ও শিশু পুত্র শুধা-পিপাসায় কাতর। মা হাজেরা নিকটস্থ সাফা পাহাড়ে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন, আবার মারওয়া পাহাড়ের ঢূঢ়ায় উঠে চারিদিকে তাকান, কোথাও কোনো কাফেলা দেখা যায় কি না, যাতে তাদের নিকট থেকে সামান্য পানি নিয়ে পিপাসা কাতর পুত্রের মুখে দেওয়া যায়। কিন্তু কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্ন দেখা গেল না। এমনিভাবে সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করলেন। তারই নির্দর্শনস্বরূপ হাজিগণ ঐ স্থানে (সাঁই) দ্রুত হাঁটেন। মা হাজেরা কোথাও পানির সন্ধান না পেয়ে শিশুর কাছে ফিরে এসে বিস্ময়ে দেখলেন, নিকটেই মাটি ফুঁড়ে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা বইছে। এ পানির ফোয়ারাই ছিল বিখ্যাত যম্যম কুপের উৎস। বিবি হাজেরা শিশু ইসমাইলকে পানি পান করিয়ে তার তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। নিজেও তৃষ্ণিসহকারে পানি পান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। মরুভূমিতে যেখানে পানি থাকে সেখানে আকাশে পাথি ওড়ে। দূর হতে তা দেখে

কাফেলা এসে জমা হয়। জুরুহম বৎশের এক বাণিজ্য কাফেলা এসে মা হাজেরার অনুমতি নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করল। তখনে আরও লোকজন এসে জড়ো হলো। সকলের বিশ্বাস, এ পুণ্যাত্মা মা ও শিশুর কল্যাণেই আল্লাহ তায়ালা এ উষর মরুর বুক চিরে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন। ধীরে ধীরে মক্কা একটি জনপদে পরিণত হলো।

হ্যারত ইসমাইল যখন কিশোর বয়সে উপনীত হলেন তখন ইব্রাহিম (আ.) একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আদেশ করলেন। আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার জন্য হ্যারত ইব্রাহিম (আ.) আপন পুত্রকে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম (আ.)-কে কাবাঘরের স্থানটি দেখিয়ে তা পুনঃনির্মাণের আদেশ দিলেন। ইব্রাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে পবিত্র কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেন। তারপর এ দোয়া করেন :

○ رَبَّنَا تَقْبِلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ : “হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এ কাজ করুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।”  
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৭)

এরপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হ্যারত ইব্রাহিম (আ.) মানুষকে হজের জন্য আহ্বান করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

○ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِإِحْجَاجٍ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ حَرْبٍ عَمِيقٍ

অর্থ : “এবং আপনি মানুষের নিকট হজের ঘোষণা করে দিন, তারা আপনার নিকট আসবে পদ্বর্জে ও সর্বপ্রকার ফৌজিকায় উষ্ট্রের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।” (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৭)

হ্যারত ইব্রাহিম (আ.)-এর আহ্বানে কাবা শরিফ আবার তাওহিদপন্থীদের পুণ্যভূমিতে পরিণত হলো। হ্যারত ইব্রাহিম (আ.) চলে গেলেন আপন কর্মসূচে। আর হ্যারত ইসমাইল (আ.) রয়ে গেলেন মক্কায়। পরবর্তীকালে তিনিও নবি হলেন। মৃত্যুর সময় কাবার দায়িত্বভার অর্পণ করে গেলেন আপন বৎশধরের উপর। কালক্রমে তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মূর্তিপূজা শুরু করল। কাবাগৃহে তারা স্থাপন করল ৩৬০টি মূর্তি। হজের সময় ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রথাগুলো পালিত হতো তবে তারা পূজা-অর্চনা করত প্রতিমার সামনে।

উত্তরাধিকার সূত্রে কুরাইশ বৎশ তখনো কাবার রক্ষক এবং হজের তত্ত্ববিদ্যাক ছিল। ফলে দেশ-বিদেশে ছিল তাদের যথেষ্ট সম্মান। এ বৎশেই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের প্রিয় নবি হ্যারত মুহাম্মদ (স.)। বাল্যকাল থেকে তিনি মূর্তিপূজাকে অপছন্দ করতেন। মক্কায় অতি অল্পসংখ্যক লোক তখনো মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতেন। তাঁদের বলা হতো হানিফ বা একনিষ্ঠ। তাঁরা মূর্তি পূজা না করে ইব্রাহিম হজ পালন করতেন। মক্কা বিজয়ের পর নবি করিম (স.) পুনরায় ইব্রাহিম হজ চালু করেন।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা হজের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

### হজের তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি স্তরের মধ্যে হজ পঞ্চম। সারাবিশ্বের মুসলিম জাতির মহাসম্মেলন। বিশ্বের সকল মুসলিম যে এক উন্নত, হজ মৌসুমে মকায় এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানগণ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মকায় একত্র হয়। সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠান পালন করে। সকলের ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, কর্মসূচি এক। সকলের পরিধানে একই ধরনের সাদা পোশাক। ভাষা, বর্ণ, জীবন পদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সকলে একই ধৰনি উচ্চারণে একাকার হয়ে যায়। সকলের হৃদয়ে এক আল্লাহর নাম। এতে পৃথিবীর সব দেশের লোকের পরম্পরার মিলনের সুযোগ হয়। পরম্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ হয়। এভাবে হজ সারাবিশ্বের মুসলমানকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বढ়নে আবদ্ধ করে। প্রতি বছর হাজিদের হজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের ফলে মুসলিম জাহানের প্রত্যেক অঞ্চলে মুসলমানের প্রাণে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইসলামের প্রাণচাধ্যল্য পরিবেশ বজায় রাখার জন্য হজের যে এক বিরাট অবদান আছে এর মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়।

### হজের ফজিলত

ইসলামে প্রত্যেকটি ইবাদতেরই যথেষ্ট গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। হজেরও অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। হজের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

مَنْ حَجَّ بِلِّيْلَفَلْمَ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَتْهُ اَمْهَ-

অর্থ : “যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারতে এসে কোনো অশীল কাজ করল না, আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কাজে লিঙ্গ হলো না, সে গুনাহ বা পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে ফিরল যেমন সে পবিত্র ছিল সেদিন, যেদিন সে তার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল।” (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেন, “তোমরা হজ ও উমরাহ পর পর করতে থাক। কারণ এ দুইটি ইবাদত দারিদ্র্য, অভাব এবং গুনাহগুলোকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন আগন্তের ভাটি লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূরীভূত করে তা বিশুদ্ধ করে দেয়। হজে মাবরুরের (মাকবুল) প্রতিদান হচ্ছে একমাত্র জাহানাত” (নাসায়ি)। যে মুসলমানদের উপর হজ ফরজ তাদের উচিত খুশি মনে হজ পালন করা।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে হজের ফজিলত ও তাৎপর্যের উপর আলোচনা করবে।

## পাঠ ৬

### হজের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত

**হজের ফরজসমূহ ( فرائض حجّ )**

**হজের ফরজ তিনটি**

১. হজের নিয়তে ইহুরাম বাঁধা।
২. আরাফার ময়দানে ৯ই জিলহজ তারিখে অবস্থান (ওকূফ) করা।
৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

**হজের ওয়াজিবসমূহ ( واجبات حجّ )**

**হজের ওয়াজিব কাজ ছয়টি**

১. আরাফার ময়দান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় মুয়দালিফায় রাত্রি যাপন করা।
২. শয়তানকে (জামরাতুল আকাবায়) কফর নিষ্কেপ করা।
৩. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো বা সাঁও করা।
৪. কুরবানি করা।
৫. মাথা মুড়ানো বা চুল ছাঁটা।
৬. তাওয়াফে বিদা অর্থাৎ মক্কার বাইরে থেকে আগত হাজিদের জন্য বিদায়কালীন তাওয়াফ করা। একে তাওয়াফুল বিদা (বিদায়ী তাওয়াফও) বলে।

**হজের সুন্নতসমূহ ( سنن حجّ )**

হজের অনেক সুন্নত রয়েছে। নিচে কয়েকটি সুন্নত উল্লেখ করা হলো :

১. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা।
২. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা।
৩. জিলহজ মাসের ৭ তারিখে ইমামের মকায় হজ সম্পর্কে খুতবা প্রদান করা। ৯ তারিখে আরাফায় দ্বিপ্রাহরের পর খুতবা প্রদান করা। একাদশ তারিখে মিনায় খুতবা দেওয়া।
৪. ৮ই জিলহজে মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা, মিনায় উপস্থিত হয়ে যোহর থেকে ৯ই জিলহজের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা।
৫. ৯ই জিলহজে সূর্য ওঠার পর মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা করা।
৬. সন্ধিব হলে আরাফাতে গোসল করা।

৭. ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা।
৮. মুয়দালিফায় রাত কাটানোর পর ফজরের নামায আদায় করে সূর্য উদয়ের পূর্বে মিনার দিকে রওয়ানা করা।
৯. জিলহজ মাসের ১১, ১২ তারিখে কংকর নিষ্কেপ (রামি) এর জন্য মিনাতে রাত্যাপন করা।
১০. জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ক্রমধারা ঠিক রেখে কংকর নিষ্কেপ করা।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা হজের ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নতগুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

## পাঠ ৭

### হজ পালনের নিয়ম

ইসলামের প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়। হজ আদায়েরও নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। নিম্নে হজ পালনের নিয়মাবলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

**ইহরাম :** ইহরাম আরবি শব্দ। এর অর্থ নিষিদ্ধ করা। নামাযের উদ্দেশ্যে যেমন তাহরিমা বাঁধতে হয়, হজের জন্যও তেমনি ইহরাম বাঁধতে হয়। এটি হজের আনুষ্ঠানিক নিয়ত। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ থেকে জিলহজ মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত যেকোনো দিন ইহরাম বাঁধা যায়। এ সময় ছাড়া অন্য সময় ইহরাম বাঁধলে হবে না। এ সময় ইহরামের পোশাক পরবে ও কিবলামুখী হয়ে সরবে তালবিয়া পাঠ করবে। হজ মৌসুম ছাড়া অন্য সময় যদি কেউ কাবাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের ইচ্ছা করে তবে তাকেও হজের ইহরাম বাঁধার স্থানে (মিকাতে) পৌছে ইহরাম বাঁধতে হবে।

#### তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ)

ইহরাম বাঁধার পর মক্কা পৌছে কাবাঘরের চারধারে তাওয়াফ করতে হয়। অর্থাৎ সাতবার ঘুরতে হয়। মক্কা শরিফ পৌছার পর এটি প্রথম তাওয়াফ। এ কারণে একে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ বলা হয়। হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করতে হয়।

**সাঈ :** আগমনি তাওয়াফ শেষ করে কাবাঘরের অন্তিম সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝের পথটি সাতবার অতিক্রম করতে হয়। একে বলা হয় সাঈ। সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে শেষ করতে হয়।

তারপর ইহরাম অবস্থায় জিলহজ মাসের সাত তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ সময়ের মধ্যে যতবার ইচ্ছা তাওয়াফ করা যায় এগুলো নফল তাওয়াফ। সাঈ করার প্রয়োজন নেই। নফল তাওয়াফে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

## ৭ই জিলহজ

এ তারিখে যোহর নামাযের পর ইমাম খুত্বা দেন। এ খুত্বায় তিনি হজ সম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ করে ৮ তারিখ মিনায় এবং ৯ তারিখ আরাফাতে করণীয় বা আহকাম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেন।

## ৮ই জিলহজ

এ তারিখে হাজিগণ সূর্যোদয়ের পর মিনায় আসেন। মিনায় যাওয়ার পূর্বে সুন্নত অনুযায়ী গোসল করে ও ইহরামের চাদর পরে ‘মসজিদুল হারাম’ বা বাইতুল্মাহ শরিফে আসেন। ইহরাম ও নিয়তের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনায় যেতে হয়। সেখানে পরের দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সুন্নত।

## ৯ই জিলহজ

নবম তারিখ আরাফার দিবস। এদিন সকালেই ‘আরাফায় অবস্থানের’ উদ্দেশ্যে মিনায় ফজরের নামায আদায় করে আরাফার ময়দানের দিকে রওয়ানা করতে হয়। এখানে ইহরামের পেছনে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসর উভয় নামায একসঙ্গে আদায় করতে হয়। নামাযের পূর্বে ইমাম খুত্বা দেন। খুত্বায় হজের বাকি বিধিবিধান বর্ণনা করেন। আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের একটি ফরজ কাজ। ৯ তারিখ অথবা অনিবার্য কারণে ৯ তারিখের রাত পরবর্তী সুবহি সাদিকের পূর্বে কোনো সময়ে এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফার মাঠে অবস্থান করতে হয়। অন্যথায় হজ হবে না। এদিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে আরাফার মাঠ থেকে মুয়দালিফায় ফিরে আসতে হয়। মুয়দালিফায় পৌছে এশার নামাযের সময়ে মাগরিব ও এশা এক সঙ্গে আদায় করতে হয়। এ রাত মুয়দালিফায় কাটাতে হয়।

## ১০ই জিলহজ

দশম দিন কুরবানির দিন। এদিন সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে হাজিগণ মিনার পথে রওয়ানা হয়। মিনার এক স্থানে শয়তানের প্রতিকৃতি হিসেবে পরপর তিনটি পাকা স্তুতি আছে। সেখানে পৌছে এদিন বড় শয়তানের প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য করে সাতটি কংকর নিষ্কেপ করতে হয়। কংকরগুলো ছোলা পরিমাণ বড় হতে হয়। হযরত ইব্ৰাহিম (আ.) যখন আল্লাহর ইঙিতে প্রাণপ্রিয় একমাত্র পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করতে যাচ্ছিলেন, তখন শয়তান পিতা-পুত্রের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে তাঁদের বিভাস করার চেষ্টা চালিয়েছিল। তাঁরা বিরক্ত হয়ে শয়তানের প্রতি পাথর নিষ্কেপ করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও নিষ্ঠার প্রতি সম্মান দেখিয়ে হাজিগণ এ পাথর নিষ্কেপ করে থাকেন।

কংকর নিষ্কেপের পর এ মিনাতেই কুরবানি করতে হয়। কুরবানির পর হাজিগণ মাথা কমিয়ে ইহরাম থেকে মুক্ত হন। চুল ছোট করলেও চলে, তবে সমস্ত মাথার চুল সম্পরিমাপে কাটিতে হয়। মেয়েদেরকে চুলের অগ্রভাগের কিছুটা (ন্যূনতম আংগুলের এক কর পরিমাণ) কাটলেই চলে। তারপর ঐ তারিখেই অথবা ১১ কিংবা ১২ তারিখে মক্কা ফিরে কাবাঘর তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। এটি হজের একটি ফরজ কাজ।

মক্কায় প্রথম প্রবেশের সময় যদি সাফা ও মারওয়ায় সাঁজি না করে থাকে তবে এ তাওয়াফের পর সাঁজি করতে হয়। আগে করে থাকলে আর প্রয়োজন হয় না। তারপর মিনায় ফিরে যেতে হয় এবং সেখানেই ১১ ও ১২ তারিখ থাকতে হয়।

১১ ও ১২ তারিখ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর মিনার তিনটি স্তম্ভের প্রতিটিতে সাতটি করে কংকর মারতে হয়। তারপর ইচ্ছে করলে ১২ তারিখেই মক্কায় ফিরে আসতে পারেন। যদি কেউ মিনায় থেকে যান তবে তাঁকে ১৩ তারিখ দ্বিপ্রহরের পর তিনটি স্তম্ভে পাথর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে হয়। এভাবে হজের কার্যাবলি সমাপ্ত করতে হয়। যারা বহিরাগত তাদের সর্বশেষ কাজ হচ্ছে বিদায়ী তাওয়াফ করা। একে ‘তাওয়াফুল বিদা’ বা প্রত্যাবর্তনকালীন তাওয়াফও বলে। বহিরাগতদের জন্য এ তাওয়াফ ওয়াজিব।

### হজের ত্রুটি ও তা সংশোধনের উপায়

হজ পালনকালে অনিচ্ছায়ও অনেক ত্রুটি-বিচুতি বা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। এই ত্রুটির কোনোটি গুরুতর আবার কোনোটি সাধারণ পর্যায়ের হয়ে থাকে। হজের ওয়াজিব পালনে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ঘটলে ‘দম’ ওয়াজিব হয়। যেমন : মাথা মুণ্ডনের পূর্বে শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করা। আর ‘দম’ হচ্ছে একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা কুরবানি করা। উট, গরু বা মহিষের এক-সপ্তমাংশও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। সাধারণভাবে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো বা হারাম শরিফ এলাকায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করলে প্রতিকার স্বরূপ ‘দম’ বা কুরবানি করতে হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদাকা দিতে হয়।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা হজ পালনের ধারাবাহিক নিয়মগুলো সংক্ষিপ্ত শিরোনামে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

### সাম্য ও বিশ্বভাস্তু প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা

হজ একান্তই ব্যক্তিগত ইবাদত। আল্লাহর প্রেমিক হাজিগণ আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভের জন্য হজ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মুসলিম সম্প্রদায় হজের মৌসুমে বিশেষভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনায় উদ্বৃত্ত হয়ে উঠে। যাঁরা হজে যান তাঁদের মন ধর্মীয় চেতনায় উদ্বৃত্ত থাকে, অনুরূপভাবে যাঁরা তাঁদের বিদায় সম্মানণ জানাতে আসে, তাঁদের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনাশক্তি জাগ্রত হয়। হাজিগণ যে স্থান দিয়ে গমন করেন, তাঁদের ‘লাববাহিক’ ধরনি শুনে সেখানকার অনেক মানুষের মনও হজের প্রতি আগ্রহী হয়।

বিভিন্ন দেশ হতে আগত হাজিদের শারীরিক কাঠামো, ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন কিন্তু তারা মিকাতের (ইহরাম বাঁধার স্থান) কাছে এসে একই ধরনের কাপড় পরিধান করে। সবার মুখে একই ধরনি প্রতিধ্বনিত করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। মক্কা ও মদিনায় একত্র হয়ে একই ইমামের পেছনে নামায আদায় করে। সমবেত মুসলিম জনতা ভাষা, জাতি, দেশ ও গোত্রের কৃত্রিম

বৈষম্য ভেঙে দিয়ে বিশ্বভাত্ত্ব স্থাপনের বিরাট সুযোগ পায়। মানুষের মনে সাম্যের ধারণা জন্মায়। হজের এই মহাসম্মেলনে পৃথিবীর সব শ্রেণির মানুষই এসে সমবেত হয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আদান-প্রদান ঘটে। ভাব বিনিময় হয়। বিশ্বশান্তি স্থাপনে এবং জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্঵ন্দ্ব, কলহ মিটিয়ে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও আত্ম স্থাপনের বিশেষ সুযোগ পায়। হজের এ শিক্ষা মানবসমাজে বাস্তবায়িত হলে, মানুষের মধ্যে বাগড়া-বিবাদ, হানাহানি, মারামারি দূর হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে।

**কাজ :** ‘বিশ্বভাত্ত্ব গড়ে উঠতে হজের সামাজিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।’ শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে। শিক্ষক মহোদয় বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন।

## পাঠ ৮

### কুরবানি ( ﺍٰلَّا ﻃَهِيْرُ)

#### কুরবানির ধারণা

কুরবানির সমার্থক শব্দ ‘উফিয়াহ’। এর অভিধানিক অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় জিলহজ মাসের ১০ তারিখ সকাল থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে পশু জবাই করা হয় তাকে কুরবানি বলে।

বর্তমানে যে কুরবানি প্রথা প্রচলিত আছে, তা হয়রত ইব্রাহিম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে। এটি আত্মত্যাগ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অন্যতম মাধ্যম। এটি একটি উন্মত্ত ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “কুরবানির দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় কাজ আল্লাহর নিকট আর কিছুই নেই। ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুরবানির পশুর শিং, ক্ষুর ও লোমসমূহ নিয়ে হাজির হবে। কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানির দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র কর।” (তিরমিয়ি)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন : “সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।” (ইবনু মাজাহ)

### কুরবানির পটভূমি

হয়রত ইব্রাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা বহুবার বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন। সকল পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করছেন। যেহেতু নবিদের স্বপ্ন ওহি বা আদেশ। তাই তিনি এই স্বপ্নকে আল্লাহর আদেশ হিসেবে গ্রহণ করলেন। বৃক্ষ বয়সের একমাত্র সন্তান ইসমাইল অপেক্ষা দুনিয়াতে অধিকতর ফর্মা নং-৬, (ইসলাম শিক্ষা, ৮ম শ্রেণি)

প্রিয় আর কী হতে পারে? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি শেষ সিদ্ধান্তে পৌছলেন, আল্লাহ যাতে খুশি হন তাই তিনি করবেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, তখন তিনি পুত্র ইসমাইলকে বললেন, “তিনি (ইব্রাহিম) বললেন : হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কী? তিনি (ইসমাইল) বললেন : হে আমার আববা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে দৈর্ঘ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।”

(সূরা আস-সাফ্ফাত, আয়াত: ১০২)

হেলের এ সাহসিকতাপূর্ণ উন্নত পেয়ে নবি ইব্রাহিম (আ.) খুশি হলেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি পুত্র ইসমাইলের গলায় ছুরি চালালেন। এবারের পরীক্ষাতেও ইব্রাহিম (আ.) উত্তীর্ণ হলেন। পবিত্র কুরআনে আছে –

وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَلْبِرِهِنِيمْ قَدْ صَلَقْتَ الرُّعْبَيْنَ

অর্থ: “আর তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম: হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নে সত্যে পরিণত করলে।” (সূরা আস-সাফ্ফাত, আয়াত: ১০৪-১০৫)

আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে বেহেশত থেকে একটি দুম্বা এনে ইসমাইলের জায়গায় ছুরির নিচে শুইয়ে দিলেন। হযরত ইসমাইল (আ.) এর পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। এ অপূর্ব ত্যাগের ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তখন হতেই কুরবানি প্রথা চালু হয়েছে। এটি আজ মুসলিম সমাজে একটি পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানরূপে স্বীকৃত।

### কুরবানির নিয়মাবলি ও বিধিবিধান

কুরবানির কতিপয় বিশেষ নিয়মাবলি ও বিধিবিধান নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. জিলহজ মাসের ১০ তারিখ ফজর হতে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক (সাহিবে নিসাব) হয়, তবে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব। মুসাফিরের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়।
২. জিলহজ মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখ তিনি দিন কুরবানির সময়। এ তিনি দিনের যেকোনো দিন কুরবানি করা যায়। তবে প্রথম দিন কুরবানি করা উন্নত।
৩. দুদুল আয়হার নামাযের আগে কুরবানি করা সঠিক নয়। নামায আদায়ের পর কুরবানি করতে হয়।
৪. সুস্থ সবল ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু দ্বারা কুরবানি করতে হয়। গরু, মহিষ এবং উটে এক হতে সাত জন পর্যন্ত শরিক হয়ে কুরবানি করা যায়।
৫. কুরবানির ছাগলের বয়স কমপক্ষে এক বছর হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে দুই বছরের হতে হবে। উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর হতে হবে। দুম্বা ও ভেড়ার বয়স ছাগলের মতো। তবে ছয় মাসের বেশি বয়সের দুম্বার বাচ্চা যদি একেপ মোটাতাজা হয় যে, এক বছরের অনেকগুলো দুম্বার মধ্যে ছেড়ে দিলে চেনা যায় না, তবে সেরূপ বাচ্চা দিয়ে কুরবানি জায়েয়। কিন্তু ছাগলের বাচ্চার বয়স এক বছর না হলে কুরবানি জায়েয় হবে না।

৬. কুরবানির গোশত সাধারণত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরিব মিসকিনকে, একভাগ আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া এবং একভাগ নিজের জন্য রাখা উত্তম ।
৭. নিজ হাতে কুরবানি করা উত্তম ।
৮. কুরবানির প্রাণী দস্তি দিকে মাথা রেখে কিবলামুখী করে, ধারালো অন্ত দ্বারা ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে জবাই করতে হয় ।

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরবানির সময় একাগ্রতার সাথে উত্তম পশু কুরবানি করা । তাতে তাঁরা অনেক সাওয়াব পাবে । পরম্পরার মধ্যে আন্তরিকতা বাঢ়বে এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে ।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে কুরবানির পটভূমি ও নিয়মাবলি আলোচনা করবে ।

## পাঠ ৯

### আকিকা (الْعَقِيقَةُ )

#### আকিকার ধারণা

‘আকিকা’ আরবি শব্দ । এর অর্থ ভাঙা, কেটে ফেলা ইত্যাদি । ইসলামি পরিভাষায় সন্তান জন্মের পর সগুম দিনে তার কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর নামে কোনো হালাল গৃহপালিত পশু জবেহ করাকে আকিকা বলা হয় ।

আকিকা করা সুন্নাত । এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায় । সন্তানের বিপদাপদ দূর হয় । কাজেই প্রত্যেক পিতামাতার উচিত নবজাত সন্তানের নামে যথাসময়ে আকিকা করা । হাদিসে আছে, “প্রতিটি নবজাত সন্তান আকিকার সাথে সম্পৃক্ত । তার জন্মের সঙ্গম দিনে তার নামে পশু জবেহ করতে হবে । তার নাম রাখা হবে, তার মাথার চুল মুণ্ডন করা হবে ।” (তিরমিয়ি)

নবি করিম (স.)-এর আগেও আকিকার প্রচলন ছিল । আল্লাহ তায়ালার অনুমতিতে তিনি তা চালু রাখেন । মহানবি (স.) নিজে আকিকা করেছেন, অন্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন । পিতামাতা আকিকা না করলে নিজের আকিকা নিজেও করা যায় । রাসুলুল্লাহ (স.) নবি হওয়ার পর নিজের আকিকা নিজেই করেছিলেন । আকিকা সন্তান জন্মের সঙ্গম দিনে করা মুস্তাহাব । সঙ্গম দিনে না পারলে ১৪, ২১ তারিখে অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত সঙ্গম দিনেও করা যায় । মাতাপিতার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সন্তান । সন্তান জন্মের সঙ্গম দিনে চারটি কাজ করা উত্তম ।

- ক. সন্তানের ইসলামি নাম রাখা ।
- খ. মাথা মুণ্ডন করা ।
- গ. মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রূপা বা তার মূল্য দান করা ।
- ঘ. আকিকা করা ।

### আকিকা আদায়ের নিয়ম

মুসলমানের প্রত্যেকটি ভালো কাজই ব্যাপক অর্থে ইবাদত। ইবাদত আদায়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আর নিয়মগতে কাজটি সমাধা করলে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। তাই আকিকা করাও একটি ইবাদত এবং তা আদায়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবাই করাই যথেষ্ট।” (নাসায়ি)

আকিকার জন্য ছেলে হলে দুটি আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা ভেড়া জবাই করতে হয় কিংবা কুরবানির গবুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই আর মেয়ের জন্য এক অংশ নেওয়া যায়।

যে সকল পশু দ্বারা কুরবানি করা যায় ঐ সকল পশু দ্বারা আকিকাও চলে। আকিকার পশুর বয়স কুরবানির পশুর বয়সের অনুরূপ হতে হবে।

আকিকার পশুর গোশত কুরবানির পশুর গোশতের ন্যায় তিনি ভাগ করে একই নিয়মে বণ্টন করতে হয়। এ গোশত সন্তানের পিতামাতা, ভাইবোন সকলেই খেতে পারে। এ গোশত রাখা করে আত্মীয় স্বজন ও গরিব মিসকিনকে খাওয়ানো যায়। চামড়া গরিব-মিসকিনকে দান করে দিতে হয়।

আকিকার পশু সন্তানের পিতার নিজ হাতে জবাই করা উচ্চম। নিজে অপারগ হলে অন্যের সাহায্যে জবাই করানো যায়।

**কাজ :** শিফ্ফার্হীরা দলে বিভক্ত হয়ে আকিকা আদায়ের নিয়মাবলি নিয়ে আলোচনা করবে।

### পাঠ ১০

#### কুরবানির শিক্ষা

কুরবানি বলতে শুধু গবু, ছাগল, মহিষ, দুম্বা ইত্যাদি জবাই করা বোবায় না। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন বোবায়। কুরবানি আল্লাহর নবি হ্যরত ইবরাহিম (আ.) ও হ্যরত ইসমাইল (আ.) এর অতুলনীয় ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ ঘোষণা করেন যে, তাদের কাছে নিজ জানমাল অপেক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল্য অনেক বেশি। তারা পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে এর রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহর কাছে শপথ করে বলে, “হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেভাবে পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজনে আমাদের শরীরের রক্ত প্রবাহিত করতেও কৃষ্ণত হব না।” কে কত টাকা খরচ করে পশু ক্রয় করেছে, কার পশু কত মোটা তাজা, কত সুন্দর আল্লাহ তা দেখতে চান না। তিনি দেখতে চান কার অঙ্গে কতটুকু আল্লাহর ভালোবাসা ও তাকওয়া আছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

*لَنْ يَنَالَ اللَّهُ حُكْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلِكُنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ*

অর্থ: “কখনো আল্লাহর নিকট পৌছায় না এগুলোর গোশত এবং রক্ত বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।”  
(সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৭)

আত্মাগ ও আত্মসমর্পণের মূর্ত্তি প্রতীক ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)। মানুষের জীবনে এ শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা হয়ে উঠবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরোপকারী ও আত্মাগী। আত্মাগী মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। নিজের সুখ শান্তির বাইরে যারা সমাজের মানুষের সুখকে বড় করে দেখে, তারাই প্রকৃত মানুষ। কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা আমাদেরকে পরোপকারে উৎসাহিত করবে ও মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটাবে।

কাজ : 'কুরবানির শিক্ষা মানুষকে আত্মাগী ও পরোপকারী হতে সাহায্য করে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে। শিক্ষক মহোদয় বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর

১. যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত ——।
২. যাকাতের মাসারিফ —— টি।
৩. ইসলামের —— স্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম।
৪. হজের অনেক —— রয়েছে।
৫. ইহরাম —— শব্দ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ৯ই জিলহজ	কুরবানির দিবস
২. ১০ই জিলহজ	আরাফার দিবস
৩. আর্কিকা করা	উন্নম
৪. সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করা	মুস্তাহাব
৫. আর্কিকা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে করা	সুন্নাত

#### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. যাকাতের সংক্ষিপ্ত ধারণা বর্ণনা কর?
২. হজের ওয়াজির কয়টি ও কী কী?
৩. যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তগুলো কী কী?

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যাকাতের ধর্মীয় ও নৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
২. সাম্য ও বিশ্বভাস্তু প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা বর্ণনা কর।
৩. বাস্তব জীবনে আত্মত্যাগী হতে কুরবানির শিক্ষা বর্ণনা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'হজ' শব্দের অর্থ কী?

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ক. সংকল্প করা  | খ. যিয়ারত করা |
| গ. তাওয়াফ করা | ঘ. সাঁই করা    |

২. হজ ও উমরাহ পর পর করার মাধ্যমে দূরীভূত হয়-

- i. দারিদ্র্য
- ii. অবিশ্বাস
- iii. পাপ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. হজের ফরজ কয়টি?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক. তিনটি  | খ. চারটি |
| গ. পাঁচটি | ঘ. দশটি  |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তাবিব সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। গত এক বছরের মোট সম্পদ থেকে নিজের প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে বাদবাকি সম্পদের একটি অংশ তিনি গরিব মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করেন। এটি তার উপর গরিব মিসকিনদের অধিকার বা হক বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার সম্পদের পরিত্রাতা নিশ্চিত হয় বলেও তিনি মনে করেন।

৪. তাবিব সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে শরিয়তের কোন বিধানটি আদায় হয়েছে?

- |          |            |
|----------|------------|
| ক. হজ    | খ. যাকাত   |
| গ. আকিকা | ঘ. কুরবানি |

৫. তাবিব সাহেবের এ বিধানটি পালন করার কারণ-

- i. অর্জিত সম্পত্তি কমপক্ষে এক বছর পর্যন্ত তার নিকট ছিল
- ii. তার নিসাব পরিমাণ সম্পদের অতিরিক্ত সম্পদ ছিল
- iii. আগামী বছর হজ করার পূর্বশর্ত পূরণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. জামান সাহেব ব্যবসা করে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তিনি প্রতি দুই বছর পর পর হজব্রত পালন করেন। কিন্তু তিনি গরিব আত্মীয়স্বজন ও এলাকার অসহায় দরিদ্র লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখেন না। তাদের কোনো অর্থিক সহায়তা করতে চান না। কিন্তু জামান সাহেবের থেকে তার ভাই আলম সাহেবের অর্থসম্পদ কম থাকলেও সন্তানের জন্মের সঙ্গম দিনে আল্লাহর নামে পশু জবেহ করে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও গরিব মিসকিনদের জন্য খানা পিনার আয়োজন করেন।

ক. হজের ফরজ কয়টি?

খ. কুরবানির ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. জামান সাহেবের কাজ-কর্মে ইসলামের কোন বিধানটি লজ্জিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আলম সাহেবের কাজটির মাধ্যমে একটি সুন্নত পালিত হলো বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

২. ফারাবি সাহেব এবং ফাহাদ সাহেব সহোদর। উভয়ে পৈত্রিকসূত্রে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছেন। ফাহাদ সাহেবকে মসজিদের ইমাম সাহেব বললেন, এবার হিজরি বছরের শেষ মাসে আল্লাহর ঘরে গিয়ে একবারের জন্য ইবাদত করে আসুন। আপনার উপর তা ফরজ। ফাহাদ সাহেব বললেন, এতো টাকা খরচ করে ইবাদত করতে আমি কিছুতেই রাজি নই। পক্ষান্তরে ফারাবি সাহেব যথেষ্ট ধার্মিক। এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গার প্রয়োজন হলে তার সবচেয়ে ভালো জায়গাটি মসজিদ নির্মাণের জন্য তিনি ওয়াকফ করে দিলেন।

ক. কোন তারিখকে আরাফাত দিবস বলা হয়?

খ. ইহুরাম শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

গ. ইমাম সাহেব ফাহাদ সাহেবকে যে ইবাদত পালনের জন্য বলেছেন তা বর্ণনা কর।

ঘ. “ফারাবি সাহেবের কর্মকাণ্ডটি ইসলামের একটি বিধানেরই প্রতিফলন”- তুমি কি বক্তব্যটির সাথে একমত? উত্তরের স্পষ্টক্ষে যুক্তি দাও।

## ত্রৃতীয় অধ্যায়

# কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি মূলত এ উৎসদ্বয় থেকেই গঢ়ীত। কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফে মানব জীবনের সকল সমস্যার মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব মূলনীতির আলোকেই ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের নীতিমালার বাইরে কোনো কিছু ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ অধ্যায়ে আমরা আল-কুরআন ও হাদিসের কতিপয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আল-কুরআনের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- তাজবিদের নুন সাকিন ও তানবিন, মীম সাকিনের নিয়ম বর্ণনা করতে পারব।
- বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতে আগ্রহী হব ও পাঠ করতে পারব।
- নির্বাচিত পাঁচটি সূরার পটভূমি (শালে নুযুল) বর্ণনা করতে পারব।
- নাযিরা তিলাওয়াতের আদব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআনের সূরা আল-কাদর, আল-ফিল, কুরাইশ এবং আন-নাস্র অর্থসহ মুখস্থ বলতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আয়াতুল কুরসি ও সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখস্থ বলতে এবং অর্থ লিখতে পারব।
- নেতৃত্ব ও আদর্শ জীবন গঠনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মোনাজাতমূলক তিনটি হাদিস অর্থসহ বর্ণনা করতে পারব।
- নেতৃত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী সামাজিক ও নেতৃত্ব জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ হব।

### পাঠ ১

#### কুরআন মজিদ

#### (الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ)

পরিচয়

কুরআন শব্দটি আরবি। এটি কারউন ( قُرْآن ) শব্দমূল থেকে উদ্ভৃত। কারউন অর্থ পড়া বা পাঠ করা। অতএব, কুরআন শব্দের অর্থ হলো পাঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাঠিত কিতাব। প্রত্যেক দিনই লক্ষ-কোটি মুসলমান এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এ গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সূরা ও আয়াত পাঠ করে থাকি। এ জন্য এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে আল-কুরআন।

ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য হ্যরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর যে কিতাব নাজিল করেছেন তাকেই আল-কুরআন বলা হয়। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। সর্বকালের সকল মানুষের জন্য এ কিতাব হিদায়াতের উৎস।

আল-কুরআন ‘লাওহে মাহফুয়ে’ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। এটি প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানের ‘বাযতুল ইয্যাহ’ নামক স্থানে এক সাথে নাজিল করা হয়। এরপর সেখান থেকে আল-কুরআন আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর উপর নাজিল করা হয়। মহানবি (স.)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরো গুহায় ধ্যানমণ্ড থাকাকালে সর্পথম সূরা আলাকের ৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্ধায় প্রযোজন অনুসারে অল্প অল্প করে নাজিল করা হয়। এভাবে ২৩ বছরে খণ্ড খণ্ড আকারে পুরো কুরআন নাজিল হয়।

আল-কুরআনের সূরাসমূহ দুইভাগে বিভক্ত। যথা- মাকি ও মাদানি। মহানবি (স.) আল্লাহর নির্দেশে নবুয়াতের অন্তর্দশ বর্ষে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। নবি করিম (স.)-এর এ হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাসমূহ মক্কা সূরাসমূহে পরিচিত। এ সূরাসমূহে সাধারণত আকাইদ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, বেহেশত-দোষখ, কিয়ামত ইত্যাদি হলো মক্কি সূরাগুলোর বিষয়বস্তু। অন্যদিকে মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাজিলকৃত সূরাসমূহকে মাদানি সূরা বলা হয়। এ সূরাসমূহে সালাত, যাকাত, সাওম, হজ, জিহাদ, হালাল-হারাম, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনের বেশ কিছু নাম রয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে এ নামসমূহ রাখা হয়েছে। এগুলো আল-কুরআনের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। নিম্নে এর কতিপয় নাম উল্লেখ করা হলো-

- ক. আল-ফুরকান (পার্থক্যকারী) : আল-কুরআন সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী। এ জন্য একে আল-ফুরকান বলা হয়।
- খ. আল-হুদা (হিদায়াত, পথপ্রদর্শন) : কুরআন মজিদের মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয় বলে একে আল-হুদা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- গ. আর রাহমাহ (রহমত, দয়া, করুণা) : পবিত্র কুরআন বিশ্বাসীর জন্য রহমত ও করুণাস্বরূপ। তাই একে রাহমাহ বলা হয়েছে।
- ঘ. আয়-ধিকর (উপদেশ, আলোচনা) : কুরআন মজিদে বহু ঘটনার আলোচনা ও বহু উপদেশ রয়েছে। তাই একে ধিকর নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- ঙ. আন-নুর (জ্যোতি, আলো) : পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে হালাল-হারামের রহস্য উন্মত্তি করে। তাই একে ‘নুর’ বলা হয়, ফলে একে ‘নুর’ বলা হয়।

কুরআন মজিদ ৩০টি (ত্রিশটি) ভাগে বিভক্ত। এর প্রতিটি ভাগকে এক একটি পারা বলা হয়। এর সূরা সংখ্যা মোট ১১৪টি। এগুলোর মধ্যে ৮৬টি সূরা মাক্কি এবং ২৮টি সূরা মাদানি। আল-কুরআনে সর্বমোট ৭টি মনজিল, ৫৪০টি বুকু ও ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ৬২৩৬টি।

### আল-কুরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল-কুরআন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাগ্রন্থ। আল-কুরআন আমাদের আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দান করে। আমরা আল্লাহ তায়ালাকে চিনতাম না। তার ক্ষমতা ও গুণাবলি সম্পর্কে জানতাম না। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর উপর কুরআন মজিদ নাজিল করেন। মহানবি (স.) আমাদের আল-কুরআন শিক্ষা দেন। ফলে আমরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করি। তাঁর আদেশ-নিষেধ জানতে পারি। কী কাজ করলে তিনি খুশি হন আর কোন কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তাও জানতে পারি। আল-কুরআন না থাকলে এগুলো সম্ভব হতো না। অতএব বোঝা গেল যে, মানব জীবনে আল-কুরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়াতের প্রধান উৎস। কোন পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে আল-কুরআন তা আমাদের দেখিয়ে দেয়। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদির পরিচয় দান করে। আল-কুরআনের নির্দেশনামতো চলে আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারি। আখিরাতে আল-কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল-কুরআনের নির্দেশ মেনে চলবে সে হবে মহাসৌভাগ্যশালী। সে পাবে চিরশান্তির জাহান। আর যে কুরআন মজিদের আদেশ নিষেধ মানবে না তার স্থান হবে যত্রণাদায়ক জাহানামে।

আল-কুরআন আমাদের নৈতিক ও মানবিক আদর্শ শিক্ষা দেয়। আল-কুরআন অনুসরণ করে আমরা উত্তম চরিত্বান্ব ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি। ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যায়, অত্যাচার, দুর্মুক্তি ইত্যাদি দূরীভূত হবে।

কুরআন মজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্দিষ্ট জাতির জন্য নাজিল হয়নি। বরং এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন মহাগ্রন্থ। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলের হিদায়াতের জন্য এ কুরআন নাজিল হয়েছে।

### আল-কুরআনের শিক্ষা

কুরআন মজিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এটি যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। এছাড়া মানুষের জীবনে যেসব সমস্যার উত্তুব হয়ে থাকে তার সমাধানের ব্যাপারে এতে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

**مَا فَرَّطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ**

অর্থ : “আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।” (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৩৮)

আল-কুরআনের সকল জ্ঞান ও শিক্ষাই সুস্পষ্ট। সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য। এতে উল্লেখিত সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য, যুগোপযোগী ও যুক্তিসংগত। এ কিতাবে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি সকল প্রকার ভুল-ত্রুটির উদ্ধের। আল-কুরআনের প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

**ذِلِكَ الْكِتَبُ لَأَرِيْبٍ فِيهِ**

অর্থ : “এটি সেই কিতাব, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২)

আল-কুরআন ইসলামি শরিয়াহ'র প্রধান উৎস। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন কেমন হবে তা এ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ কীভাবে ইবাদত করবে, কীভাবে চরিত্র গঠন করবে তাও এ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

প্রথ্যাত ইসলামি চিত্তাবিদ হ্যরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবি (র.)-এর মতে, আল-কুরআনে বহু জ্ঞানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো মোট পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা-

১. ইলমুল আহকাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান।
২. ইলমুল মুখাসামা বা বিতর্ক বিদ্যা।
৩. ইলমুত তায়কির বি আলা ইল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও নির্দর্শন সম্পর্কিত জ্ঞান।
৪. ইলমুত তায়কির বি আইয়ামিল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিজগতের অবস্থা, তার প্রদত্ত পুরস্কার ও শান্তি সংক্রান্ত জ্ঞান।
৫. ইলমুত তায়কির বিল মাউত ওয়ামা বাদাল মাউত বা মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কিত জ্ঞান।

প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআন মানবজাতির মহামুক্তির সনদ। এটি মানুষকে আলোর দিকে পরিচালনা করে। শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়। সুতরাং আমরা আল-কুরআন পড়ব। এর অর্থ জানব এবং তদনুযায়ী আমল করব। আল-কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করব।

**কাজ :** এ পাঠ পড়ে কুরআন মজিদের শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থী যা জানতে পেরেছে তা তার পাশের বন্ধুকে বলবে।

## পাঠ ২

### তাজবিদ (الشجعى)

কুরআন মজিদ তিলাওয়াতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত। এর দ্বারা বান্দা বিরাট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। শুধু তিলাওয়াতকারীই নয় বরং তিলাওয়াতকারীর

মাতাপিতাও এতে সম্মানিত হন। হাদিসে এসেছে— যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে মুকুট পরানো হবে। এ মুকুটের ঔজ্জ্বল্য সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি হবে। অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উন্নত যে কুরআন শেখে এবং অপরকেও শিক্ষা দেয়।” (বুখারি)

তিনি আরও বলেছেন, “তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা নিজ পাঠকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।” (মুসলিম)

অতএব বোঝা গেল কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমল। আমরা বেশি বেশি নিয়মিত কুরআন পড়ব এবং অন্যকেও কুরআন পড়তে উৎসাহিত করব।

### তাজবিদের শুরুত্ব

সহিহ শুন্দভাবে কুরআন পাঠের রীতিকে তাজবিদ বলে। আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত লাভের জন্য সহিহ- শুন্দভাবে কুরআন পড়তে হবে। আর এ জন্য তাজবিদের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাজবিদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে পাঠকারী গুনাহগার হবে এবং তার নামায শুন্দ হবে না। তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَرِتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

অর্থ : “আপনি ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করুন।” (সূরা আল-মুয়্যাম্রিল, আয়াত: ৪)

একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “ইলমে কুরআনে পারদশী ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতার দলভূক্ত, যারা নেককার ও আল্লাহর হৃকুমে লেখার কাজে ব্যস্ত। আর যে ব্যক্তি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বারবার চেষ্টা করে কুরআন তিলাওয়াত করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।” (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং আমরা নিয়মিত তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করব। যদি কুরআন তিলাওয়াত করতে কষ্ট হয় তবুও পড়তে চেষ্টা করব। কোনো অবস্থাতেই কুরআন তিলাওয়াত ত্যাগ করব না। আর তাজবিদ শিক্ষা করব। এতে আমরা বিরাট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারব।

### পাঠ ৩

## নুন সাকিন ও তানবিনের বর্ণনা

নুন সাকিন : জয়মযুক্ত নুনকে নুন সাকিন বলা হয়। অর্থাৎ যে নুনের উপর জয়ম ( — ) থাকে তাকে নুন সাকিন বলে। যেমন— **أُنْ-أُنْ-أُنْ**

তানবিন : দুই যবর ( ۲ ) , দুই যের ( ۳ ) ও দুই পেশকে ( ۴ ) তানবিন বলা হয় । তানবিনের মধ্যে একটি জয়মযুক্ত নুন উহ্য অবস্থায় থাকে । উচ্চারণের সময় তা প্রকাশ পায় । যেমন- رَجْلُ - এর উচ্চারণ হবে رَجْلُنْ -এর মতো । অর্থাৎ ل (লাম) হরফের তানবিনের বদলে ل -এর উপর পেশ ও নুন সাকিন পড়া হয় ।

### নুন সাকিন ও তানবিনের হৃকুম

নুন সাকিন ও তানবিনের উচ্চারণ একই রকম । এজন্য এ দুটির বর্ণনা তাজবিদশাস্ত্রে একসাথে করা হয় । তাজবিদে নুন সাকিন ও তানবিনের হৃকুম চারটি । অর্থাৎ চারটি নিয়মে নুন সাকিন ও তানবিনকে পড়তে হয় ।

এগুলো হলো-

১. ইদগাম ( إِدْغَام )
২. ইখফা ( إِخْفَا )
৩. ইযহার ( إِظْهَار )
৪. কালব ( قَلْب ) বা ইকলাব ( قِلَاب )

নিম্নে আমরা এগুলো সম্পর্কে জানব ।

### ইদগাম

ইদগাম শব্দের অর্থ মিলিয়ে পড়া, এক জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে মেলানো । এক হরফকে অন্য হরফের সাথে মিলিয়ে সংক্ষিপ্ত করে পড়া ।

তাজবিদের পরিভাষায় নুন সাকিন বা তানবিনের পর ইদগামের ছয়টি হরফ থেকে কোনো একটি হরফ থাকলে নুন সাকিন বা তানবিনের সাথে ঐ হরফকে সংক্ষিপ্ত করে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলা হয় ।

ইদগামের ফলে উভয় হরফ একই সময়ে উচ্চারিত হয় । ইদগামের ফলে নুন সাকিন বা তানবিনের পরবর্তী হরফটি তাশদিদ ( ۵ ) যুক্ত হয় । যেমন- مَنْ رَبَّكَ

ইদগামের হরফ মোট ছয়টি । যথা-

ي - ر - م - ل - و - ن

এগুলোকে একত্রে مُلْوُنْ বলা হয় । ইদগাম মোট দুই প্রকার । যথা :

ক. গুরাহসহ ইদগাম

খ. গুরাহ ছাড়া ইদগাম

ক. গুন্নাহসহ ইদগাম : নুন সাকিন বা তানবিনের পর ۝ - ۹ - ۴ এই চারটি হরফের যেকোনো একটি আসলে নুন সাকিন বা তানবিনকে ঐ হরফের সাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে গুন্নাহসহ ইদগাম বলে। এর অপর নাম ইদগামে নাকিস। যেমন- **حَطَّةٌ تَغْفِرُ لِكُمْ - مَنْ يَقُولُ** এখানে ۝ নুন সাকিন ও তানবিন এর পর ইয়া ( ۴ ) এবং ۝ (নুন) হরফ আসায় নুন সাকিন ও তানবিনকে ইয়া ও নুন এর সাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

খ. গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম : নুন সাকিন বা তানবিনের পর ۝ - ۱ (রা, লাম) এ দুটি হরফের কোনো একটি হরফ আসলে নুন সাকিন বা তানবিনকে গুন্নাহ না করে ঐ হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। একে গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম বলে। এর অন্য নাম ইদগামে কামিল। যেমন :

**مِنْ لَدُنْكَ - عَفْوٌ رَّحِيمٌ**

উপরের উদাহরণ দুটিতে নুন সাকিন ও তানবিনের পরে ۝ (রা) এবং ۝ (লাম) হরফ এসেছে। ফলে নুন সাকিন ও তানবিনকে এদের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। তবে একেত্রে গুন্নাহ করা যাবে না।

ব্যতিক্রম : ইদগামের নিয়মে আমরা কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাই। যেমন- **صِنْوَانٌ - بُنْيَانٌ - دُنْيَا**

এ শব্দসমূহে নুন সাকিনের পর ۴ (ইয়া) এবং ۹ (ওয়াও) হরফ এসেছে। কিন্তু এখানে ইদগামের নিয়মে নুন সাকিনকে পরবর্তী হরফের সাথে মিলিয়ে তাশদিদসহ পড়া হয় না। এর কারণ ইদগামের উদ্দেশ্য হলো শব্দের উচ্চারণকে সহজ করা। এসব শব্দে মিলিয়ে পড়লে উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়। এজন্য এ শব্দগুলোতে ইদগাম হয় না।

### ইথফা (إِخْفَاء)

ইথফা অর্থ গোপন করে পড়া। ইথফার হরফ ১৫টি। যথা-

ت-ث-ج-د-ذ-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ف-ق-ك

নুন সাকিন বা তানবিনের পর ইথফার হরফ থেকে যেকোনো একটি হরফ এলে উক্ত নুন সাকিন বা তানবিনকে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করার মতো নাসিকা সংযোগে গোপন করে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে ইথফা বলে।

নুন সাকিনের মধ্যে ইথফার উদাহরণ :

**مِنْ تَحْتِهَا - مُنْذِرِينَ - مِنْ كُمْ - مَنْ يَعْجِلُ - مَنْ فَعَلَ - عِنْدِي**

তানবিনের মধ্যে ইথফার উদাহরণ :

**ذَرَّةٌ شَرًّا - نِعْمَةٌ تُبْخِزِي - ظِلَّةٌ ظَلِيلًا**

### ইয়হার (إِظْهَار)

ইয়হার শব্দের অর্থ স্পষ্ট করে পড়া, প্রকাশ করে দেওয়া ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় নূন সাকিন বা তানবিনের পর ইয়হারের কোনো একটি হরফ আসলে ঐ নূন সাকিন বা তানবিনকে গুল্লাহ না করে স্পষ্টভাবে নিজ মাখরাজ থেকে পড়াকে ইয়হার বলে।

ইয়হারের হরফ মোট ছয়টি। যথা- ح خ ح ۱۰۶

এ হরফগুলোকে হরফে হালকি বলা হয়।

উদাহরণ- مِنْ خَيْرٍ - عَزِيزٌ عَلَيْهِ مِنْهُمْ

### কালব বা ইকলাব قُلْب বা إِقْلَاب

কালব বা ইকলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া। তাজবিদের পরিভাষায় নূন সাকিন বা তানবিনের পর ب (বা) হরফ আসলে ঐ নূন সাকিন বা তানবিনকে মীম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ পরিমাণ গুল্লাহসহ পড়াকে কালব বা ইকলাব বলে।

ইকলাবের হরফ মাত্র একটি। এটি হলো- ب (বা)। উদাহরণ: مِنْ بَعْدِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

উল্লেখ্য, কুরআন মজিদে ইকলাবের অবস্থায় নূন সাকিন বা তানবিনের পাশে ছোট করে মীম হরফটি উল্লেখ থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নূন সাকিন ও তানবিনের নিয়ম চারটি লিখে একটি চার্ট তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

## পাঠ ৪

### মীম সাকিনের বর্ণনা

মীম সাকিন : জ্যমযুক্ত মীম (م)-কে মীম সাকিন বলে। অর্থাৎ মীম হরফের উপর জ্যম (م) থাকলে তাকে মীম সাকিন বলা হয়। যেমন- لَكُمْ

মীম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি: যথা-

ক. ইয়হার (إِظْهَار)

খ. ইদগাম (إِدْغَام)

গ. ইখফা (إِخْفَا)

## ইয়হার

ইয়হার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া। মীম সাকিনের পর **ب** (বা) এবং **م** (মীম) ছাড়া অন্য যে কোনো হরফ আসলে ঐ মীম সাকিনকে স্পষ্ট করে গুল্লাহ ব্যতীত নিজ মাখরাজ থেকে পড়াকে মীম সাকিনের ইয়হার বলা হয়। যথা-

**لَكُمْ دِيْنُكُمْ - أَمَّ لَمْ تُنذِرْهُمْ**

## ইদগাম

ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। জ্যমযুক্ত মীম-এর পর হরকত যুক্ত মীম এলে উভয় মীমকে একসাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুল্লাহ করে পড়াকে ইদগাম বলে। এছেত্রে দ্বিতীয় মীমের উপর তাশদিদ যুক্ত হয়। যেমন-

**فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ**

## ইখফা

ইখফা অর্থ গোপন করে পড়া। মীম সাকিনের পর **ب** (বা) আসলে ঐ মীম সাকিনকে এক আলিফ পরিমাণ গুল্লাহ করে পড়তে হয়। একে মীম সাকিনের ইখফা বলে। যথা-

**عَلَيْكُمْ بِالْبُوْمِنِيْنَ - وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ**

কাজ : মীম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি শিক্ষার্থী খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ৫

### নাযিরা তিলাওয়াত (الْتِلَوَةُ النَّاطِرَةُ)

নাযিরা তিলাওয়াত হলো দেখে দেখে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা। নাযিরা তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের ফজিলতের বর্ণনা আমরা জেনেছি। অতএব আমরা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করব এবং এর পূর্ণ ফজিলত লাভ করতে চেষ্টা করব।

## কুরআন তিলাওয়াতের আদব

কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার বাণী। আল্লাহ তায়ালা যেমন মহান তেমনি তার পবিত্র কালামও মহান। আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্য সব কালামের চেয়ে এত বেশি, যেমন আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টিজগতের চেয়ে বেশি। অতএব, সর্বোচ্চ সম্মান ও আদবের সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে উল্লেখ করা হলো :

- ক. পূর্ণরূপে ওয়ু করে পাক-পবিত্র স্থানে বসা ।
- খ. কিবলামুঠী হয়ে নামায়ের অবস্থার মতো বসা ।
- গ. তিলাওয়াতের আগে কয়েক বার দরূদ শরিফ পড়া ।
- ঘ. আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে তিলাওয়াত শুরু করা ।
- ঙ. হিফয বা মুখস্থ করার নিয়ত না থাকলে ধীরে স্থিরে তাজবিদের সাথে তিলাওয়াত করা ।
- চ. সক্ষম হলে অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা ।
- ছ. অর্থ বুঝে না আসলে কুরআন মজিদের প্রতি ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়া ।
- জ. সুন্দর সুরে তিলাওয়াত করা ।
- ঝ. তিলাওয়াতের সময় কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা না করা ।
- ঝঃ. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিলাওয়াত করা ।
- ট. তিলাওয়াত শেষে খুব সম্মান ও তাযিমের সাথে কুরআন মজিদকে পবিত্র উঁচুস্থানে রেখে দেওয়া ।

আমরা আদবের সাথে নিয়মিত কুরআন পড়ব। পবিত্র কুরআনের প্রতি যেন কোনোরূপ বেয়াদবী না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখব।

নাযিরা তিলাওয়াতের জন্য নির্ধারিত পাঠ-সূরা বাকারার ৯ম রক্তু থেকে ১২তম রক্তু ।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সম্মুখে শুন্দ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং বাড়িতেও শুন্দ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করবে ।

## অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআনের ৫টি সূরা

### পাঠ ৬ সূরা আল-কাদর (سُورَةُ الْقَدْرِ )

সূরা আল-কাদর আল-কুরআনের অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন সূরা। এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি। সূরা আল-কাদর কুরআন মজিদের ৯৭তম সূরা। এ সূরায় 'লাইলাতুল কাদর'-এর ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরায় লাইলাতুল কাদর শব্দটি মোট তিনবার এসেছে। এর কাদর শব্দ থেকে এ সূরার নাম রাখা হয় সূরা আল-কাদর।

#### শানে নুযুল

একদা রাসুলুল্লাহ (স.) বনি ইসরাইলের এমন একজন লোক সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, যিনি সমস্ত রাত ইবাদতে লিঙ্গ থাকতেন এবং সারা দিন জিহাদ করতেন। এভাবে এক হাজার মাস যাবৎ অবিরাম আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মগ্ন থাকেন। এ বিবরণ শুনে সাহাবিগণ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। অতঃপর নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আফসোস করতে লাগলেন।

সাহাবিগণ ভাবলেন— আমরা এক হাজার মাস ইবাদত করার সুযোগ পাব না। অথচ পূর্ববর্তীগণ বহু বছর বেঁচে থাকতেন। বেশি দিন ইবাদত করার সুযোগ পেতেন। ফলে আমরা ইবাদতের সাওয়াবে কোনো দিন তাদের সমান হতে পারব না। সাহাবিগণের আফসোসের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। এতে তিনি জানিয়ে দেন যে, লাইলাতুল কাদরের এক রাতের ইবাদত হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।

#### শব্দার্থ

<b>أَنْزَلْنَا</b>	- আমি অবতীর্ণ করেছি, নাজিল করেছি	<b>مَا</b>	- কী, যা
<b>لَيْلَةُ</b>	- রাত, রজনী	<b>خَيْرٌ</b>	- ভালো, উত্তম
<b>الْقَدْرِ</b>	- পরিমাণ, ভাগ্য, মর্যাদা, মহিমা	<b>الْفُ</b>	- হাজার, সহস্র
<b>لَيْلَةُ الْقَدْرِ</b>	- মহিমাধূত রাত	<b>شَهْرٌ</b>	- মাস
		<b>تَبَرْكٌ</b>	- অবতীর্ণ হয়, নাজিল হয়, অবতরণ করে
		<b>الْمُلْكَةُ</b>	- ফেরেশতাগণ

<b>وَالرُّوحُ</b>	-	আত্মা, জিবরাইল (আ.) এর অপর নাম রূহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা	<b>حَتْنِي</b>	-	পর্যন্ত, যতক্ষণ না
<b>إِذْنُ</b>	-	অনুমতি, অনুমোদন	<b>سَلَامٌ</b>	-	শান্তি
			<b>مَطْلَعٌ</b>	-	আবির্ভাব, উদয়
			<b>الْفَجْرِ</b>	-	প্রভাত, ফজরের সময়, উষা।

## অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○

১. নিচ্যাই আমি এটি (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে।

وَمَا آتَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○

২. আর আপনি কি জানেন এ মহিমান্বিত রাতটি কী?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○

৩. মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

تَنْزُلُ الْمَلِئَكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ○

৪. সে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাইল ফেরেশতা) তাঁদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।

سَلَمٌ هِيَ حَتْنِي مَطْلَعُ الْفَجْرِ ○

৫. সে রাতের উষা উদয় হওয়া পর্যন্ত শান্তিই শান্তি (বিরাজ করে)।

## ব্যাখ্যা

লাইলাতুল কাদর বা কাদরের রাত অত্যন্ত মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত রাত। আল্লাহ তায়ালা এ রাতেই পরিত্র কুরআন নাজিল করেন। এ রাতের ইবাদত হাজার মাস একাধারে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। এক হাজার মাস ৮৩ বছর ৪ মাসের সমান। আমাদের আযুক্তাল খুবই সীমিত। এ অবস্থায় এ রাতে ইবাদত করলে আমাদের নেকির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এটি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ। এ রাতে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকে রহমত, বরকত ও শান্তির সওগাত দিয়ে প্রেরণ করেন। এ রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুখ-শান্তি ও রহমত বিরাজ করতে থাকে।

**শিক্ষা :** এ সূরা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা পাই:

- লাইলাতুল কাদর অত্যন্ত মহিমান্বিত রাত।
- এ রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।
- এ রাতে ফেরেশতাগণ শান্তি ও কল্যাণ নিয়ে দুনিয়ায় নেমে আসেন।
- এ রাতে সারাক্ষণ শান্তি ও রহমত বর্ধিত হয়।

আমরা যথাযথভাবে লাইলাতুল কাদর উদযাপন করব। বেশি বেশি নফল ইবাদত বন্দেগি করব। এ রাতের সামান্য সময়ও আমরা ইবাদত না করে কঠিন না। তাহলে আমরা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা বেশি সাওয়াব লাভ করব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জীবনে শান্তি ও কল্যাণ দান করুন।

**কাজ :** শিফার্থীরা এ সূরার শানে নুযুল পড়বে এবং তা তাদের খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ৭

### সূরা আল-যিলযাল (سُورَةُ الْبِلْزَالِ)

আল-কুরআনের ১৯তম সূরা আল-যিলযাল। এ সূরায় কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত যিলযাল শব্দ থেকে এর নাম রাখা হয়েছে সূরা আল-যিলযাল। এটি মদিনা নগরীতে অবস্থিত হয়। এর আয়াত সংখ্যা আটটি।

## শানে নুযুল

একদা জনৈক ব্যক্তি একজন ফকিরকে অতি অল্প পরিমাণ খাদ্য দান করে। অতঃপর সে বলল যে, এ সামান্য দানে কি সাওয়াব হবে?

অপর এক ব্যক্তি ছোট ছোট গুনাহ করত। এগুলো থেকে বিরত থাকত না। বরং সে এগুলোকে অবহেলা করত। আর এগুলোর কোনো গুরুত্ব দিত না।

এ নূই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। আর সকলকে জানিয়ে দেন যে, পৃথ্বী বা পাপ তা যত ছোটই হোক না কেন কিয়ামতে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতঃপর এগুলোর জন্যও পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

### শব্দার্থ

<b>إِذَا</b>	- যখন	<b>يَصُدُّرُ</b>	- বের হবে, প্রকাশিত হবে
<b>زُلْزَلٍ</b>	- কম্পিত হবে	<b>أَشْتَأْتَ</b>	- ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, পৃথক পৃথকভাবে
<b>الْأَرْضُ</b>	- জমিন, পৃথিবী, মাটি	<b>أَعْمَلُ</b>	- আমলসমূহ
<b>وَآخْرَجَتِ</b>	- বের করে দেবে	<b>مِشْقَالُ</b>	- পরিমাণ
<b>أَثْقَالَ</b>	- বোঝাসমূহ, ভরসমূহ	<b>ذَرَّةُ</b>	- বিন্দু, অণু, ক্ষুদ্রতম অংশ
<b>قَالَ</b>	- বলবে	<b>خَيْرٌ</b>	- উত্তম, ভালো
<b>يَوْمَئِنِ</b>	- সেদিন	<b>شَرٌّ</b>	- মন্দ, খারাপ, নিকৃষ্ট
<b>تُحْكِيُّ</b>	- বর্ণনা করবে, কথা বলবে	<b>يَرَةٌ</b>	- সে তা দেখবে
<b>أَخْبَارَ</b>	- সংবাদসমূহ, খবরসমূহ		

### অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

إِذَا زُلْزَلِتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ○

১. যখন পৃথিবী আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।

وَآخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ○

২. আর পৃথিবী যখন তার (অভ্যন্তরস্থ) ভরসমূহ বের করে দেবে।

وَقَالَ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ

৩. এবং মানুষ বলতে থাকবে এর (পৃথিবীর) কী হলো?

يَوْمَئِنِ تُحْكَىٰ أَخْبَارُهَا

৪. সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

৫. কেননা আপনার প্রতিপালক তাকে (এজন্য) আদেশ করবেন।

يَوْمَئِنِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَأْتَاهُ لَيَرُوُا أَعْمَالَهُمْ

৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখানো যায়।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

৭. কেউ অণু পরিমাণ সংকাজ করলে তা সে দেখবে।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

৮. আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে, তাও সে দেখতে পাবে।

## ব্যাখ্যা

এ সূরায় কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের বর্ণনা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এক সময় গোটা দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। তিনি হ্যরত ইসরাফিল (আ.)-কে শিঙায় ফুর্তকার দেওয়ার আদেশ দেবেন। হ্যরত ইসরাফিল (আ.)-তখন শিঙায় ঝুঁক দেবেন। তাঁর শিঙার শব্দে সারা পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাবে। পৃথিবী চরমভাবে কাঁপতে থাকবে। পৃথিবীর দালানকোঠা, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা সমস্ত কিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আসমান ভেঙ্গে যাবে। ভূপৃষ্ঠ তার ভেতরের সবকিছু বের করে দেবে। কবরসমূহ থেকে মানুষ বের হয়ে আসবে। এসব কিছু দেখে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে। এরপর সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্র হবে। সেখানে তাদের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কাজকর্মও সেদিন হিসাবের বাইরে থাকবে না। বরং ছোট পাপ করলেও তার শাস্তি পেতে হবে। অন্যদিকে অণু পরিমাণ পুণ্য করলেও সেদিন মানুষ তার আমলনামায় দেখতে পাবে। এ পরিমাণ পুণ্যেরও প্রতিদান দেওয়া হবে।

শিক্ষা : এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- কিয়ামতে পৃথিবীর অবস্থা হবে ভয়াবহ। সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।
- মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে।
- হাশের ময়দানে মানুষ নিজ নিজ আমলনামা দেখতে পাবে।
- কুন্দ্র কুন্দ্র পাপ বা পুণ্য কোনো কিছুই এ আমলনামায় বাদ পড়বে না।

আমরা সর্বদা কিয়ামত, হাশের ও আখিরাতের কথা স্মরণ রাখব। সেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে।

সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। পাপ-পুণ্য যত কুন্দ্রই হোক না কেন সেদিন তাও আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। সুতরাং আমরা ছেট বড় কোনো পাপকে অবহেলা করব না, বরং সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকব।

**কাজ :** শিক্ষার্থী সূরা যিল্যালের চারটি শিক্ষা তার পাশের সহপাঠীকে বলবে এবং তা খাতায় লিখবে।

## পাঠ ৮

### সূরা আল-ফিল (سُورَةُ الْفِيلِ)

সূরা ফিল আল-কুরআনের ১০৫তম সূরা। এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি। ফিল অর্থ হাতি। এ সূরায় হস্তিবাহিনীর করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা ফিল।

#### শানে নুয়ুল

আরবের ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল আবরাহা। সে ছিল খ্রিষ্টান। সে সানআ নামক স্থানে একটি সুন্দর ও বহু মণিমুক্তা খচিত গির্জা তৈরি করে। অতঃপর মানুষকে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আহ্বান করে। সে চাইল মানুষ যেন মক্কা শরিফে অবস্থিত পবিত্র কাবাগৃহ ছেড়ে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আগমন করে। কিন্তু মানুষ কাবাগৃহকে খুব সম্মান করত। সুতরাং তারা তার আহ্বানে সাড়া দিল না। তারা আগের মতোই কাবাগৃহে উপাসনা করতে লাগল। এতে আবরাহা ক্ষিণ হয়ে উঠল। সে চিন্তা করল- কাবাগৃহ ধ্বংস না করলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। এ জন্য সে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য মক্কা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে বহু দৈন্য সংগ্রহ করে এবং ১৩টি বিশালকায় শক্তিশালী হাতি নিয়ে অগ্রসর হয়।

আবরাহার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর দাদা ও কুরাইশদের সর্দার। তিনি জানতেন যে কাবা হলো আল্লাহর ঘর। সুতরাং এ ঘরের রক্ষার দায়িত্বও আল্লাহরই উপর। আব্দুল মুত্তালিবের নির্দেশে কুরাইশগণ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পরদিন ভোরে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে কাবা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাথি প্রেরণ করলেন। এগুলো ছিল একপ্রকার ছোট পাথি। এরা দুই পায়ে দুটি এবং ঠোঁটে একটি করে কংকর নিয়ে এলো। অতঃপর এগুলো আবরাহার বাহিনীর উপর নিষ্কেপ করল। ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আর আবরাহা আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল। পরে তার ক্ষতস্থানে পচন ধরে এবং ভয়ঙ্কর কষ্টের পর সে মারা যায়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তার ঘরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

হস্তিবাহিনীর ঘটনাটি ৫৭০ সালে সংঘটিত হয়। আমাদের প্রিয়নবি (স.) এ বছরই জন্মগ্রহণ করেন। এ অলৌকিক ঘটনা তাঁর জন্মের ৫০দিন পূর্বে ঘটেছিল। আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে এ বিশেষ ঘটনা সকলকে জানিয়ে দেন।

### শব্দার্থ

<b>الْمُتَرَّ</b>	- আপনি কি দেখেননি?	<b>أَرْسَلَ</b>	- তিনি প্রেরণ করেন।
<b>كَيْفَ</b>	- কীভাবে, কীরক্ষে	<b>طَلِيْرًا</b>	- পাথি
<b>أَصْحَابٍ</b>	- সঙ্গীগণ, সাথীগণ, অধিপতি, মালিক	<b>أَبَايِيلَ</b>	- আবাবিল, একপ্রকার ছোট পাথি যা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে
<b>الْفَيْلِ</b>	- হাতি	<b>جَارَةً</b>	- পাথর
<b>الْمُرْجِعُ</b>	- তিনি কি করেননি?	<b>سِجِّيلٍ</b>	- কংকর, নুড়িপাথর
<b>كَيْدَ</b>	- ঘড়যন্ত্র, গোপন চক্রান্ত, কৌশল	<b>عَصْفٍ</b>	- তৃণ, খড়-কুটো
<b>تَضْلِيلٍ</b>	- ব্যর্থতা, ব্যর্থ করে দেওয়া	<b>مَأْكُولٍ</b>	- ভক্ষিত, যা ভক্ষণ করা হয়েছে।

### অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

الْمُرْتَأَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَنْجِلِيْفِيْلِ ۝

- আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক হস্তি বাহিনীর প্রতি কিন্তু আচরণ করেছিলেন?

الْمُرْجِعَلِ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۝

- তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি ?

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أَبَابِيلَ ۝

- আর তিনি তাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন ।

تُرْمِيْهِمْ بِحَجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلِ ۝

- সেগুলো তাদের উপর কংকর জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করে ।

فَعَلَهُمْ كَعْصِفَ مَأْكُولِ ۝

- অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত ত্ণসদৃশ করেন ।

### ব্যাখ্যা

ইয়ামানের বাদশাহ আবরাহা ছিল অনেক ধন-সম্পদ ও সৈন্য-সামন্তের অধিকারী । তার ছিল বিশাল হস্তিবাহিনী । কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কুদরতের তুলনায় এসব ধন-সম্পদ, ক্ষমতা কিছুই না । বরং আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই হয় । তিনি যাকে যেভাবে ইচ্ছা লাঢ়িত, অপমানিত করতে পারেন ।

আবরাহা গর্ব ও অহংকারবশত আল্লাহ তায়ালার সাথে শত্রুতা করে । ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায় । আল্লাহ তায়ালা ছোট ছোট পাখির সাহায্যে তার বিশাল বাহিনী ধ্বংস করে দেন । বক্ষত এটা ছিল আল্লাহর কুদরত মাত্র । আল্লাহর সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতাকারীদের তিনি এভাবেই ধ্বংস করে থাকেন ।

**শিক্ষা :** এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- আল্লাহদ্রোহীদের আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন ।
- তিনি তাদের সমস্ত কলাকৌশল ব্যর্থ করে দেন ।

আমরা আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস রাখব। তার আদেশ-নিমেধ মেনে চলব। তার দীনের সাথে কখনো শত্রুতা করব না।

কাজ : সূরা ফিল নাজিল হওয়ার পটভূমি সম্পর্কে শিক্ষার্থী বন্ধুকে বলবে এবং এ সূরার শিক্ষা নিয়ে তার সাথে আলোচনা করবে।

## পাঠ ৯

### সূরা কুরাইশ (سُورَةُ قُرْيَشٍ)

সূরা কুরাইশ মুক্তায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা চারটি। এটি আল-কুরআনের ১০৬তম সূরা। এ সূরায় মক্কা নগরীর কুরাইশদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে সূরা কুরাইশ।

#### শানে নুযুল

পবিত্র কাবাগৃহ মক্কা নগরীতে অবস্থিত। এ গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার দায়িত্ব ছিল কুরাইশ সম্প্রদায়ের উপর। এজন্য কুরাইশগণ বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করত। লোকজন তাদের সম্মান করত। তাদের শেত্ত মেনে চলত। তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করার সাহস পেত না। এ সুযোগে তারা সিরিয়া, ইয়ামান প্রভৃতি দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। চোর-ডাকাত, ছিনতাইকারীরা তাদের বাধা দিত না। এমনকি শীত-গ্রীষ্মের প্রতিকূল পরিবেশেও তারা সকলের সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে পারত। তাছাড়া হজ উপলক্ষে বিপুল লোকজন মক্কা নগরীতে আসত, এতে কুরাইশগণ বহু অর্থ-সম্পদ লাভ করত।

কুরাইশদের এসব মানসম্মান ও ধন-সম্পদ ছিল মূলত কাবা গৃহের বদৌলতে। সুতরাং তাদের উচিত ছিল এ গৃহের প্রভুকে মেনে চলা। অথচ তারা তা করত না। বরং তারা ছিল মুশরিক। তারা মৃত্তিপূজা করত। আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাস করত না। রিসালাত ও আখিরাতেও তারা বিশ্বাস করত না। এমনকি রাসুলুল্লাহ (স.) যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন তখনো তারা তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল। এ জন্য ও অনৈতিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে তাদের সতক করে দেন।

#### শব্দার্থ

إِيلِف

- আসক্তি, অনুরাগ

قُرَيْش

- কুরাইশ বংশীয় লোক

رِحْلَة

- ভ্রমণ, সফর

الشَّيْءَاءُ

الصَّيْفُ

هَذَا

الْبَيْتُ

- শীতকাল

- গ্রীষ্মকাল

- এই

- ঘর, বাড়ি

<b>الَّذِي</b>	- যিনি, যে	<b>جُوعٌ</b>	- ক্ষুধা
<b>أَطْعَمَ</b>	- আহার দিয়েছেন	<b>آمَنَ</b>	- নিরাপদ করেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন
<b>هُمْ</b>	- তাদের	<b>خُوفٍ</b>	- ভয়-ভীতি

### অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

لَا يَلِفِ قُرْيِشٌ ○

১. যেহেতু কুরাইশের আসক্তি রয়েছে ।

الْفِهْمُ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ ○

২. আসক্তি রয়েছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের ।

فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ○

৩. অতএব, তারা এ ঘরের মালিকের ইবাদত করুক ।

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ○

৪. যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন আর তাদের নিরাপদ করেছেন ভয়-ভীতি থেকে ।

### ব্যাখ্যা

এ সূরায় কুরাইশদের নানা নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । অতঃপর এসব নিয়ামতের পরিবর্তে তাদের কী করা উচিত এ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।

মক্কা নগরীতে কাবা গৃহ অবস্থিত । কাবা হলো আল্লাহর ঘর । এ জন্য আল্লাহ তায়ালা মক্কার কুরাইশদের নানা সুবিধা প্রদান করেন । তিনি তাদের সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা দান করেন । ক্ষুধা ত্যওয়ায় খাদ্য, পানীয় দান করেন । সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা । যে ঘরের বদৌলতে তারা এসব লাভ করলো সে ঘরের মালিকের ইবাদত করা । কেননা তিনিই তাদের এসব দান করেছেন ।

শিক্ষা : এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ :

- আল্লাহ তায়ালা আমাদের খাদ্য-পানীয় ও নিরাপত্তা দান করেন।
- তিনি সকল নিয়ামতের মালিক।
- সকলেরই উচিত তার ইবাদাত করা।

অতএব, আমরা সবসময় আল্লাহর ইবাদত করব। তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করব। তাহলে তিনি আমাদের প্রতি নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেবেন।

**কাজ :** সূরা কুরাইশের তিনটি শিক্ষা শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখিবে ও শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ১০

### সূরা আন-নাসৰ (سُورَةُ النَّصْرِ)

সূরা আন-নাসৰ পবিত্র কুরআনের একটি সূরা। এই সূরা মুক্তায় বিদায় হজের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু যে সমস্ত সূরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো স্থান নির্বিশেষে মাদানি সূরা। এজন্য এ সূরাও মাদানি সূরা। এর আয়াত সংখ্যা তিন। সূরা আন-নাসৰ পবিত্র কুরআনের ১১০তম সূরা। এ সূরার 'নাসৰ' শব্দ থেকে সূরাটির নাম রাখা হয়েছে আন-নাসৰ।

#### শব্দার্থ

إِذَا	- যখন	دِينُ اللَّهِ	- আল্লাহর দীন
جَاءَ	- আসবে	أَفْوَاجًا	- দলে দলে
نَصْرُ اللَّهِ	- আল্লাহর সাহায্য	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ	- অতঃপর আপনি প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন
وَ	- এবং, ও	رَبِّكَ	- আপনার প্রতিপালকের
الْفَتْحُ	- বিজয়	وَاسْتَغْفِرْهُ	- এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন
رَأَيْتَ	- আপনি দেখবেন	إِنَّهُ	- নিশ্চয়ই তিনি
النَّاسَ	- মানুষ	كَانَ	- হন, হলেন, আছেন, রয়েছেন
يَدْخُلُونَ	- তারা প্রবেশ করছে	تَوَّابًا	- তওবাকরুলকারী
فِي	- মধ্যে		

#### অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

○ إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ وَالْفَتْحُ

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

○ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।

○ فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفَرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا

৩. তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসন তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি তো তওবাকরুলকারী।

### ব্যাখ্যা

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, সূরা আন-নাসর কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোনো সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয় নি। এ সূরাতে মক্কা বিজয়ের পর মানুষ যে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের এ বিজয়ের ফলে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নবৃত্যতী দায়িত্বের পরিপূর্ণতা ও বোঝানো হয়েছে। তাই বিশিষ্ট সাহাবিগণ এ সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ওফাত নিকটবর্তী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। মহানবি (স.)-এর দুনিয়াতে আগমন ও অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে বলে এ সূরায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সূরা দ্বারা আরও বোঝানো হয়েছে যে, কোনো ব্যাপারে যখন আল্লাহর সাহায্য করেন তখন অনেক অসাধ্য কাজও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। তখন আল্লাহর প্রশংসন করা আবশ্যিক।

শিক্ষা : এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ :

- আমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।
- আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সফলতা লাভ করা যায় না।
- কোনো কাজে সফলতা আসলে আল্লাহর প্রশংসন ও পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত।
- যাবতীয় ক্রটি, অপরাধ বা পাপকাজের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

অতএব, সকল সাওয়াবের কাজ করতে ও পাপকাজ থেকে বাঁচতে আমরা আল্লাহর সাহায্য চাইব। যখন আমাদের সফলতা আসবে তখন আমরা আল্লাহর প্রশংসন করব। আর যদি কোনো ক্রটি হয়ে যায়, এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা সূরা আন-নাসের চারটি শিক্ষা খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

### পাঠ ১১

### আয়াতুল কুরসি (إِيَّاهُ الْكُرْسِيِّ)

আলোচ্য আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার ২৫৫নং আয়াত। এটি আল-কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ আয়াত।

কুরসি শব্দের অর্থ একবন্ধুর সাথে অন্য বন্ধুর মিলানো। এ জন্য চেয়ার বা আসনকে কুরসি বলা হয়। কেননা আসনে অনেক কাঠকে একত্র করা হয়। কুরসি শব্দের অন্য অর্থ হলো সাম্রাজ্য, মহিমা, জ্ঞান

ও সিংহাসন। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, ক্ষমতা, মহিমা ও গৌরবের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য এ আয়াতকে আয়াতুল কুরসি বলা হয়।

### ফজিলত

আয়াতুল কুরসি অত্যন্ত বরকতময় আয়াত। রাসুলুল্লাহ (স.) এ আয়াতকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে অভিহিত করেছেন। মহানবি (স.) বলেছেন- ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো বাধা থাকে না।’ (নসাই)

অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (স.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রভাতে ও শয়নকালে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিয়ি)

অপর এক হাদিসে এসেছে, একদা, ‘রাসুলুল্লাহ (স.) উবাই ইবনু কাবকে জিজ্ঞাসা করলেন- কুরআনের কোন আয়াতটি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ। উবাই (রা.) বললেন, তা হলো আয়াতুল কুরসি। উত্তর শুনে রাসুলুল্লাহ (স.) তা সমর্থন করলেন এবং বললেন- হে আবুল মুন্দির! [উবাই (রা.)-এর ডাকনাম] এ উত্তম জ্ঞানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।’ (মুসলিম)

### শব্দার্থ

<b>الله</b>	- ইলাহ, মাবুদ,	<b>خَلْفَ</b>	- পেছনে
<b>هُوَ</b>	- সে, তিনি	<b>لَا يُجِيبُونَ</b>	- তারা আয়ত করতে পারে না, বেষ্টন করতে পারে না
<b>الْحَقِّي</b>	- চিরঞ্জীব	<b>شَيْءٍ</b>	- জিনিস, বস্তু
<b>الْقَيْوْمُر</b>	- চিরস্থায়ী, সর্বসন্তার ধারক	<b>عِلْمٌ</b>	- জ্ঞান
<b>لَا تَأْخُذْنَا</b>	- তাকে স্পর্শ করে না	<b>شَاءَ</b>	- তিনি ইচ্ছা করেছেন
<b>سِنَةٌ</b>	- তন্দু	<b>وَسِعَ</b>	- তা বিস্তৃত হয়েছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে
<b>تَوْمُر</b>	- ঘূম, নিদ্রা	<b>لَا يَكُونُدَهُ</b>	- তাকে ঝান্ট করে না, তার জন্য কষ্টকর হয় না
<b>السَّهْوَتِ</b>	- আসমানসমূহ	<b>جُهْدٌ</b>	- রক্ষণাবেক্ষণ
<b>الْأَرْض</b>	- জমিন, পৃথিবী, ভূপৃষ্ঠ	<b>الْعَلِيُّ</b>	- অতিমহান, সুউচ্চ
<b>يَشْفَعُ</b>	- সে সুপারিশ করবে	<b>الْعَظِيمُ</b>	- সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান
<b>عِنْدَ</b>	- নিকট, কাছে		

## অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই ।

أَكُنْ أَنْقَيُّ مِنْهُ

তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ।

لَا تُخْلِدْنِي سَيِّئَاتِي وَلَا نَوْمٌ

তন্দ্রা বা নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না ।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সমস্ত তারই ।

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কে আছে এমন, যে তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করবে?

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন ।

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ

তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তার জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ন্ত করতে পারে না ।

وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

তার কুরসি আসমান ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত ।

وَلَا يَنْعُودُهُ حِفْظُهُمَا

আর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্রান্ত করে না ।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

আর তিনি অতি মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ ।

### তাৎপর্য

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি ও ক্ষমতা এ আয়াতে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে।

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইলাহ, তিনি ব্যতীত কোনো মারুদ নেই। সকল ইবাদত ও প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য নির্ধারিত। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি চিরকাল ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তার জ্ঞান অসীম, সকল কিছুই তার জ্ঞানের আওতাধীন। তিনি মহান সন্তা। আসমান জমিনের বিশালতা তার কাছে কিছুই না। তিনি ক্লান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদির উদ্দেশ্য। এককথায় তিনিই সর্বশক্তিমান, সকল শক্তির আধার, মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

**কাজ :** আয়াতুল কুরসি পাঠের ফজিলত একটি কাগজে লিখে তা শিক্ষার্থী পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখবে।

### পাঠ ১২

### সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত

সূরা হাশর পরিত্র কুরআনের ৫৯তম সূরা। সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ ২২, ২৩ এবং ২৪ তম আয়াত নিম্নে অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

**ফজিলত :** এ তিন আয়াতের ফজিলত অত্যন্ত বেশি। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- যে ব্যক্তি সকালে তিনবার

**أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**

(উচ্চারণ : আউয়ু বিল্লাহিস সামিইল আলিমি মিনাশ শাইতানির রাজিম।) পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সন্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করে দেবেন। তাঁরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে। সেদিন সে মারা গেলে শহিদের মৃত্যু লাভ করবে। আর সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি এভাবে পাঠ করবে সেও এ ফজিলত লাভ করবে। (তিরমিয়ি)

### শব্দার্থ

<b>হু</b>	- সে, তিনি	<b>الْغَيْبٌ</b>	- অদ্বিতীয়
<b>الَّذِي</b>	- যে, যিনি	<b>الشَّهَادَةُ</b>	- দৃশ্যমান, উপস্থিত
<b>عِلْمٌ</b>	- জ্ঞানী	<b>الرَّحْمَنُ</b>	- দয়াময়

<b>الرَّحِيمُ</b>	- পরম দয়ালু	<b>الْقُدُّوسُ</b>	- পবিত্র
<b>الْمَلِكُ</b>	- অধিপতি	<b>السَّلَمُ</b>	- শান্তি
<b>الْعَزِيزُ</b>	- পরাক্রমশালী	<b>الْمُؤْمِنُ</b>	- নিরাপত্তা দানকারী
<b>الْجَبَّارُ</b>	- প্রবল	<b>الْمُهَمَّيْمُونُ</b>	- রক্ষক, রণাবেঙ্গণকারী
<b>الْمُتَكَبِّرُ</b>	- অতি মহিমান্ধিত	<b>الْأَسْمَاءُ</b>	- নামসমূহ
<b>سُبْحَنَ</b>	- পবিত্র, মহান	<b>الْحُسْنَى</b>	- সুন্দর
<b>يُشْرِكُونَ</b>	- তারা শিরক করে, অংশীদার স্থাপন করে।	<b>يُسَيِّحُ</b>	- সে তাসবিহ পড়ে, মহিমা ঘোষণা করে
<b>الْخَالِقُ</b>	- সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা	<b>الْحَكِيمُ</b>	- প্রজ্ঞাময়, প্রজ্ঞাবান
<b>الْبَارِئُ</b>	- উদ্ভাবনকারী		
<b>الْمُصَوِّرُ</b>	- রূপকার, রূপদাতা		

## অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।

عَلِيهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ

তিনি দৃশ্য ও অদ্রশ্যের পরিজ্ঞাতা।

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○

তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

২. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ

তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি

الْمُؤْمِنُ الْمُهَمَّيْمُونُ

তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই রক্ষক,

	الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ	তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমাপ্রিয় ।
	سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُنْهَا كُوْنُونٌ ۝	তারা যা কিছু শরিক স্থির করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান ।
৩.	هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ	তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা ।
	الْبَارِزُ الْمُصَوِّرُ	উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা ।
	لَهُ الْأَلْفَافُ الْخَسْنَىٰ ۖ	তার জন্যই রয়েছে উন্নম নামসমূহ ।
	يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ	আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ।
	وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝	তিনিই পরাক্রমশালী, প্রভাময় ।

## ব্যাখ্যা

এ আয়াতসমূহ আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামে পরিপূর্ণ । আল্লাহ তায়ালার এসব গুণবাচক নাম তার ক্ষমতা ও পরিচয়ের স্বরূপ প্রকাশ করে । তিনি সর্বশক্তিমান । আসমান জমিন সবকিছুর মালিক । তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয় । তিনি ব্যতীত আর কেনো ইলাহ নেই । তিনিই একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ । আসমান ও জমিনের সবই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে । সুতরাং মানুষের উচিত একমাত্র তারই দাসত্ত্ব করা । সর্বাবস্থায় তারই ইবাদত বন্দেগি করা ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা হাশেরের শেষের আয়াত তিনটি মুখস্থ করে অর্থসহ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে ।

## পাঠ ১৩

### আল-কুরআন ও নেতৃত্ব শিক্ষা

আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব । এটি জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস । নেতৃত্ব ও মানবিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ কিতাব বিশেষ ভূমিকা পালন করে । কুরআন মজিদ হলো নেতৃত্বকার আধার । নীতি-নেতৃত্বকার সকল দিকই এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে । পবিত্র কুরআনে নানাভাবে নেতৃত্বকার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে । এ পাঠে আমরা নেতৃত্ব শিক্ষা প্রদানে আল-কুরআনের নানা দিকের কথা জানব ।

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। এতে আল্লাহ তায়ালার পরিচয়ও বর্ণনা রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার নানা গুণের পরিচয় পাই। যেমন- তিনি করুণাময়, অসীম দয়ালু, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ। মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া আমাদের কর্তব্য।

আল-কুরআন থেকে আমরা এসব গুণের পরিচয় লাভ করব। এরপর আমরা এগুলোর চর্চা করব। ফলে নীতি-নৈতিকতার দ্বারা আমরা আমাদের চরিত্র সুন্দর করতে পারব।

দুনিয়াতে আগমনকারী নবি-রাসূলগণের বর্ণনা রয়েছে আল-কুরআনে। এতে তাঁদের পরিচয়, তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। নবি-রাসূলগণের সফলতা, কৃতিত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি তাঁদের চরিত্রের ভূষণ ছিল। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির জন্য আদর্শ। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে তারাই সফলতা লাভ করেছে। আর আল-কুরআনের শিক্ষার দ্বারাই আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারি।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন নবি-রাসূলগণের সর্দার। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সকল গুণের পরিপূর্ণ সমষ্টি তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

**لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُ حَسَنَةٌ**

অর্থ : “নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্রে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।” (সূরা আল-আহ্যাৰ আয়াত: ২১)

মহানবি (স.)-এর চরিত্র ও নৈতিকতার কথা কুরআন মজিদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার উম্মুল মুমিনিন হ্যরত আয়োশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন-

**كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ**

অর্থ : “আল-কুরআনই তো তাঁর (রাসূলের) চরিত্র।” (মুসলিম)

অর্থাৎ আল-কুরআনের সমস্ত শিক্ষা ও নৈতিকতাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। এসব শিক্ষা অনুশীলন করে আমরা ও প্রিয়নবি (স.) এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার অনুকরণ করতে পারি।

কুরআন মজিদে পূর্ববর্তী বঙ্গ জাতি ও মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যারা তাদের পাপ ও অনৈতিক কাজের জন্য ধৰ্ষণ হয়ে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন- আদ জাতি, ছামুদ জাতি, ফিরআউন, নমরুদ, কারুন ইত্যাদি। এসব জাতি ও ব্যক্তিদের বর্ণনা আমাদের অনৈতিকতা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেয়। অতএব তারা যেসব অনৈতিক কাজ করত তা থেকে আমরা বিরত থাকব। আর সর্বাবস্থায় নৈতিকতার অনুশীলন করব।

নেতৃত্বক জীবনযাপনের জন্য অনেক নির্দেশনা আল-কুরআনে দেওয়া হয়েছে। এগুলো আমাদের নেতৃত্বক জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। নিচে নীতিমূলক কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো:

۱. ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكِّهَا وَقَذَّخَابَ مَنْ دَسَّهَا ۚ ۻ﴾

অর্থ : “সে-ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে। আর যে নিজেকে কল্যাণিত করবে সেই ব্যর্থ হবে।” (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৯-১০)

۲. ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۢ ۳﴾

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৩)

۳. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَحْسَانِ ۴﴾

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচারের নির্দেশ প্রদান করেন।” (সূরা আল-নাহল, আয়াত: ৯০)

۴. ﴿ وَأَنْ تَعْفُواً أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۵﴾

অর্থ : “আর ক্ষমা করে দেওয়াই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৭)

۵. ﴿ وَأَوْفُوا بِمَا عَاهَدْتُمْ ۝ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۷﴾

অর্থ : “আর তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতে) জিজ্ঞাসা করা হবে।” (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৪)

এভাবে আল-কুরআনের বহু আয়াতে নেতৃত্বক গুণাবলি অনুশীলনের জন্য আদেশ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনেক কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। আমরা অনেকিকতা থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধমূলক কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

۱. ﴿ وَكُلُّنَا وَآشِرُّ بُوأَوْلَتُسِرِ فُؤَادٍ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۸﴾

অর্থ: “আর তোমরা খাও ও পান কর। তবে অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ তায়ালা) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।” (সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত: ৩১)

۲. ﴿ وَلَا تَصِرِّخْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَحْشَاءٍ فَخُورٍ ۹﴾

অর্থ: “আর অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধৃতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধৃত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।” (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৮)

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَنِّيَّا فَكَرِهُتُمُوهُ ۖ ۴.

অর্থ : “আর তোমাদের একে যেন অপরের পেছনে নিন্দা না করে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশাত ভষ্ফুণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর।” (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত: ১২)

এছাড়া আরও অনেক আয়াতের দ্বারা মানবজাতিকে নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা এসব শিক্ষা জানব এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করব। ফলে আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে। আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করব।

#### কাজ :

- ক. শিক্ষার্থীরা আল-কুরআনের নীতিমূলক আয়াত পাঁচটি অর্থসহ একজন অন্যজনের কাছে মুখস্থ বলবে।
- খ. শিক্ষার্থীরা নীতিমূলক আয়াত পাঁচটি কাগজে লিখে নিজ নিজ পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখবে।

### পাঠ ১৪

## মোনাজাতমূলক তিনটি হাদিস

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। তিনি সর্বদাই মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন। কিসে মানুষের ভালো হবে, কী কাজ করলে মানুষ সফলতা লাভ করবে, তা দেখিয়ে দিতেন। দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের নানা পদ্ধা তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন। এর একটি হলো মোনাজাত। তিনি জানতেন আল্লাহ তায়ালার নিকট মোনাজাত করার মাধ্যমে আমরা সার্বিক কল্যাণ লাভ করতে পারি। এজন্য তিনি আমাদের বহু মোনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিসের কিতাবসমূহে মোনাজাতমূলক বহু হাদিস আমরা দেখতে পাই। এ পাঠে আমরা মোনাজাতমূলক তিনটি হাদিস শিখব।

#### হাদিস-১

اللَّهُمَّ مُصِّرِّفُ الْقُلُوبِ صَرِفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

অর্থ : “হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহ ফিরানোর মালিক! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও।” (মুসলিম)

#### হাদিস-২

اللَّهُمَّ ظَهِّرْ قَلْبِي مِنَ التِّفَاقِ، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ -

অর্থ : “হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে মুনাফিক থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার চোখকে খিয়ানত থেকে, আর আমার জিহবাকে মিথ্যা থেকে পবিত্র কর। কেননা চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্পর্কে তুমি অবশ্যই অবগত।” (বায়হাকি)

### হাদিস-৩

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ-**

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সুস্থতা, পবিত্রতা, উন্নতি এবং তাকদিরের উপর সন্তুষ্ট থাকার মন মানসিকতা কামনা করি।” (বায়হাকি)

উপরোক্ত মোনাজাতমূলক হাদিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো চর্চার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আধিরাতের প্রভৃতি কল্যাণ লাভ করতে পারি। অতএব, আমরা অর্থসহ এ মোনাজাতগুলো শিখব। এরপর এগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট মোনাজাত করব। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সর্বোন্নম সফলতা দান করবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মোনাজাতমূলক হাদিস তিনটি অর্থসহ মুখস্থ করবে এবং এগুলো দ্বারা নিয়মিত আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করবে।

## পাঠ ১৫

### হাদিসের আলোকে নৈতিক শিক্ষা

মানুষের জীবন ও সমাজকে সুন্দর করতে হলে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ অপরিহার্য। উন্নত চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত কোন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী। নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য তিনি সকলের নিকট প্রশংসিত ছিলেন। তাঁর নীতি-নৈতিকতা এবং আদর্শ চরিত্রের বিবরণ হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দানের জন্য মহানবি (স.)-এর আবির্ভাব। মহানবি (স.) বলেছেন-

**إِنَّمَا بِعُثْتُ لِأَتْمِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ-**

অর্থ : “উন্নত চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।” (মুসনাদে আহমাদ)

পবিত্র কুরআনে নৈতিকতা অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে। মহানবি (স.)- এর হাদিসেও নৈতিকতা অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কী কী নৈতিক গুণ অর্জন করলে মানবজীবন

সুন্দর ও সফল হবে মহানবি (স.)-এর পবিত্র হাদিসে এ সম্পর্কে যেমন তার বিবরণ রয়েছে তেমনি অনেতিক কার্যাবলি বর্জনেরও জোর তাগিদ রয়েছে।

সততা, সত্যবাদিতা, শালীনতাবোধ, সৃষ্টির সেবা, আমানত রক্ষা, ক্ষমা, দয়া, পরোপকারিতা, ধৈর্য, ভ্রাতৃভূবোধ, সমাজসেবা, দেশপ্রেম, পরমতসহিষ্ণুতা, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য এবং শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা, ছেটদের প্রতি স্নেহ, সহপাঠীদের প্রতি সুন্দর আচরণ ইত্যাদি নৈতিক গুণের বিবরণ হাদিস শরিফে রয়েছে। মহানবি (স.) নিজ জীবনে এসব নৈতিক গুণ বাস্তবায়ন করে নিজেকে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

অন্যদিকে তিনি মহানবি (স.) অনেতিক আচার আচরণ যেমন- মিথ্যাচার, পরনিন্দা, গালি দেওয়া, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, অহংকার, অশ্রীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি, সন্ত্রাস ইত্যাদি বর্জন করার জোর তাগিদ দিয়েছেন এবং এসবের কুফল ও ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তিনি তাঁর হাদিসে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

নৈতিকতা ও অনেতিকতা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস নিম্নে বর্ণিত হলো-

দয়া-মায়া ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন-

*إِنَّمَّا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْجُمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.*

অর্থ: “তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।” (তিরমিয়ি)

শালীনতা সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন- *إِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيلَ*

অর্থ : “নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশালীন ও দুশ্চরিত্ব ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।” (তিরমিয়ি)

আমানত সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, *لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ*

অর্থ : “যার আমানতদারি নেই তার ইমানও নেই।” (মুসনাদে আহমাদ)

শ্রমিকের পারিশ্রমিক দ্রুত আদায়ের তাগিদ দিয়ে মহানবি (স.) বলেন,

**أَعْطُوا الْأَجِرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْيَقَ عَرْقُهُ۔**

অর্থ : “শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।” (ইবনু মাজাহ)

মহানবি (স.) এভাবে অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে নেতৃত্ব শিক্ষাকে যেমন জগতবাসীর নিকট তুলে ধরেছেন তেমনি অনৈতিকতা ও অসচরিত্র থেকেও বেঁচে থাকতে মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাঁর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- **الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ**

অর্থ : “সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান, যার জিহবা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।” (বুখারি ও মুসলিম)

মহানবি (স.) বলেন- **إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فِيَّنَ الحَسَدُ يَا كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ**

অর্থ : “তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, হিংসা তেমনি পুণ্যকে ধ্বংস করে দেয়।” (আবু দাউদ)

মহানবি (স.) বলেন- **مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا**

অর্থ : “যে আমাদের ধোকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” (মুসলিম)

মহানবি (স.) বলেন, “মহান আল্লাহ তার ইচ্ছা অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না।” (বায়হাকি)

মহানবি (স.)-এর পবিত্র হাদিস আমরা অধ্যয়ন করে নেতৃত্ব ও সচরিত্র সম্পর্কে জানব এবং আমাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করব। আবার অনৈতিক কাজ ও অসচরিত্রের দিকগুলো সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস জানব। এসবের ফলিতে প্রভাব সম্পর্কে জানব এবং সেসব বর্জন করে চলব। এতে আমাদের জীবন সুন্দর হবে। সবাই আমাদের ভালোবাসবে। আমরা জীবনে সফল হব। পরকালে আমরা মৃত্তি ও জাল্লাত লাভ করব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা মহানবি (স.)-এর হাদিসের আলোকে নেতৃত্ব ও অনৈতিক কার্যাবলির তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

## অনুশীলনী

### শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ইদগাম মোট —— প্রকার ।
২. আরবের ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল —— ।
৩. আয়াতুল কুরসি অত্যন্ত —— আয়াত ।
৪. —— তো তার (রাসুলের) চরিত্র ।
৫. যার আমানতদারি নেই তার —— নেই ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যে ব্যক্তি প্রতারণা করে	১০৬ তম সূরা
২. সূরা আল-হাশর পরিব্রহ কুরআনের	পাঁচটি
৩. সূরা কুরাইশ আল-কুরআনের	৫৯তম সূরা
৪. সূরা আল-ফিলের আয়াত সংখ্যা	আটটি
৫. সূরা আল-যিলযালের আয়াত সংখ্যা	সে আমার উম্মত নয়

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নুন সাকিন ও তানবিনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।
২. সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াতের প্রথম আয়াতটির অর্থ লেখ ।
৩. মোনাজাতমূলক তিনটি হাদিসের যেকোনো একটির অর্থসহ ব্যাখ্যা লেখ ।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে কুরআনের ভূমিকা বর্ণনা কর ।
২. নৈতিক শিক্ষার ফেন্টে হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর ।
৩. সূরা আল-কাদরের অর্থ ও শিক্ষা বর্ণনা কর ।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইদগামের হরফ কয়টি?

- |        |          |
|--------|----------|
| ক. দুই | খ. চার   |
| গ. ছয় | ঘ. পনেরো |

২. পাপ ও অনৈতিক কাজের জন্য ধর্ষণ করা হয়েছিল-

- i. আদ জাতিকে
- ii. ছায়দ জাতিকে
- iii. বনি ইসরাইলকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাদী কুরআন তিলাওয়াতের সময় নূন সাকিন বা তানবিনের পর হরফ আসলে ঐ নূন সাকিন বা তানবিনকে মীম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ গুরুত্বসহ পড়েন।

৩. সাদীর তিলাওয়াতকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক. ইয়হার | খ. ইদগাম |
| গ. ইখফা   | ঘ. ইকলাব |

৪. সাদী এভাবে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য পরিকালে পাবে-

- i. শান্তি
- ii. স্বন্তি
- iii. মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. “দুনিয়াতে মানুষের উপর অর্পিত ইসলামের বিধি বিধান যেমন- নামায, রোয়া পালন করলে পরকালে এটার পুরক্ষার পাওয়া যাবে”। শিক্ষকের এই বক্তব্যটি সম্পর্কে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সাবিহা তার দাদুর নিকট জানতে চাইল। দাদু তাকে বুবিয়ে বললেন, এসব দৃশ্যমান কর্মকাণ্ড অবশ্য পালনীয়। এছাড়া আল্লাহর উপর ইমান আনসহ অদৃশ্যমান কিছু বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য পরকালে পুরক্ষার পাওয়া যাবে। তিনি আরো বললেন এসব বিষয় আল কুরআনে সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়েছেন।

ক. তাজবিদ এর অর্থ কী?

খ. আল-কুরআনকে আসমানি কিতাব বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. সাবিহার শিক্ষকের বক্তব্যটি কোন সূরার প্রতিফলন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাবিহার দাদুর বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২. রায়হান ও আবু সালেহ দুই বন্ধু। তারা উভয়েই রম্যান মাসে ইবাদত বন্দেগী করে কাটাবে বলে মনস্থির করলো। রায়হান রম্যানের ২০ তারিখ হতে বাসার নিকটবর্তী মসজিদে দিনরাত অবস্থান করে ইবাদত বন্দেগী করতে লাগলো। অন্যদিকে রায়হানের মতো মসজিদে অবস্থান না করে আবু সালেহ রোয়ার দিনে ইবাদত বন্দেগি করতে লাগলো। প্রতি রাতে মসজিদে এশার নামাযে আবু সালেহ ইমাম সাহেবের তিলাওয়াত শোনার প্রতি তেমন মনোযোগী থাকত না।

ক. শানে নুযুল এর অর্থ কী?

খ. সূরা আল কাদরের ফজিলত বর্ণনা কর।

গ. আবু সালেহ কুরআন তিলাওয়াত শোনার ক্ষেত্রে শরিয়তের কোন বিধানটি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রায়হানের রম্যানের শেষ দশ দিনের মসজিদে অবস্থান করে ইবাদত করা হাজার মাস ইবাদতের চেয়ে উন্নত- বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

## চতুর্থ অধ্যয়

### আখলাক (الْخَلَقُ)

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের প্রকাশ পায় তাকে আখলাক বলে। আখলাক (الْخَلَقُ) আরবি শব্দ ‘খুলুকুন’ (خُلُقٌ) এর বহুবচন। যার অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সকল দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- সদাচরণের ধারণা, ধৈর্য, ভাস্তু, নারীর মর্যাদা, সমাজসেবা, দেশপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণনা করতে পারব।
- অসদাচরণের ধারণা, অহংকার, অশ্লীলতা, পরশ্চীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি, ঘূষ, সন্ত্রাস এগুলো পরিহারের গুরুত্ব ও প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইচআইভি-এর ধারণা ও ইসলামের দৃষ্টিতে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব।

#### পাঠ ১

### আখলাকের প্রকার (أَقْسَامُ الْخَلَقِ)

আখলাক দুই ভাগে বিভক্ত।

#### ১. আখলাকে হামিদাহ (الْخَلَقُ الْحَمِيدُ)

মানবজীবনের উন্নত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্র বলে। যেমন— ধৈর্য, সততা, দেশপ্রেম, সমাজসেবা প্রভৃতি। এ সকল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সমাজে নন্দিত ও সম্মানিত।

#### ২. আখলাকে যামিমাহ (الْخَلَقُ الْيَمِيمُ)

মানবজীবনের নিকৃষ্ট চরিত্রকে আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন— অহংকার, ঘৃণা, মিথ্যাচার, সুদ, ঘূষ, অশ্লীলতা প্রভৃতি। এ সকল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও নন্দিত।

#### আখলাকের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে আখলাকের গুরুত্ব সর্বাধিক। আখলাকই উন্নত জাতির জীবনীশক্তি। যে জাতির চরিত্র যত ভালো থাকে, সে জাতি তত শক্তিশালী। যে জাতির চরিত্র ঠিক নেই, সে জাতি পৃথিবীতে ঢিকে থাকতে

পারে না। সকল নবিই নিজ নিজ জাতিকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। আর উন্নত চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য শেষ নবি হয়রত মুহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন। মহানবি (স.) বলেন,

إِنَّمَا يَعْشُّ لِأَتْقَمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : “উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।” (মুসনাদে আহমাদ)

উত্তম চরিত্র ব্যক্তিকে সুন্দর ও উন্নত করে। আর সমাজের সকল মানুষ চরিত্রবান ব্যক্তিকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। অপরদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তি সকলের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত। যার চরিত্র যত উন্নত ধর্মের দিক থেকেও সে তত অগ্রসর।

নবি করিম (স.) বলেন-      أَلْبُرُ حُسْنُ الْخُلُقِ

অর্থ : “উত্তম চরিত্রই হলো সকল নেক কাজের মূল কথা।” (মুসলিম)

চরিত্র মানুষের ভূষণ। চরিত্রবলেই মানুষ সর্বত্র সমাদৃত হয়। ভালো চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি অধিকতর ইমানদার হয়। মহানবি (স.) বলেন -      أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অর্থ : “চরিত্রের বিচারে যে লোক উত্তম, মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণতম ইমানের অধিকারী।” (আবু দাউদ ও তিরমিয়ি)

কিয়ামতের দিন পরিমাপদণ্ডে উত্তম চরিত্রের ওজন হবে অত্যন্ত ভারী।

নবি করিম (স.) বলেন, “মুমিনের পরিমাপদণ্ডে কিয়ামতের দিন উত্তম চরিত্র অপেক্ষা ভারী জিনিস আর কিছুই নেই।” (তিরমিয়ি)

উত্তম চরিত্র মানুষের পাপকে খণ্ডন করে দেয়। নবি করিম (স.) বলেন, “উত্তম চরিত্র পাপকে এমনভাবে বিগলিত করে যেমনভাবে সূর্যতাপ বরফকে বিগলিত করে।” (তাবারানি, বাযহাকি)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আবিরাতে তার উত্তম চরিত্রের বিনিময়ে অত্যধিক মর্যাদা লাভ করবে। মহানবি (স.) বলেন, “বান্দা তার উত্তম চরিত্রের বলে আবিরাতে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানিত স্থানে উন্নীত হবে, যদিও সে ইবাদতের দিক থেকে দুর্বল থাকে।” (তাবারানি)

আমরা উত্তম চরিত্র অর্জন করব। নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার করব। আমরা দুনিয়াতে সকলের কাছে প্রিয় হব। পরকালে অশেষ মর্যাদা লাভ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আখলাকে হামিদাহ-এর (সদাচরণের) সুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

## কতিপয় আখলাকে হামিদাহ (الْأَخْلَاقُ الْحَمِيدَةُ)

### পাঠ ২ ধৈর্য (الصَّابُرُ)

ধৈর্য এর আরবি প্রতিশব্দ ‘সবর’ (الصَّابُرُ)। যার অর্থ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিরত রাখা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে সহিষ্ণুতার সাথে আল্লাহর বিধান মোতাবেক সকল কর্তব্য পালন করাকে ধৈর্য বলে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধৈর্য বিশ্লেষণ করলে এর তিনটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. অবৈধ ও হারাম বস্তু থেকে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে বিরত রাখতে ধৈর্যধারণ করতে হয়।
২. আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করতে হয়।
৩. যেকোনো বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করতে হয়।

### তাৎপর্য

ধৈর্য মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। এটি মানবজীবনের সফলতার চাবিকাঠি। ধৈর্যের অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় না। ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন কাজ তথাপি সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য তা করা অপরিহার্য। সমাজ জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণময় জীবন্যাপনের জন্য ধৈর্যের (সবরের) গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে অফুরন্ত প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرٌ هُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ : “অবশ্যই ধৈর্যশীলগণকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে।” (সূরা আয়-যুমার, আয়াত: ১০)

ধৈর্যের বিপরীত হচ্ছে অধৈর্য। অধৈর্য মানুষকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। এ কারণে জীবনে চলার পথে মানুষকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে।

মানুষের জীবনে আসে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, সফলতা-বিফলতা ও জয়-পরাজয়। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের প্রয়োজন হয়। বিপদে যেমন সুনিনের আশায় ধৈর্যধারণ করতে হয়, তেমনি সুনিনে আত্মহারা না হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হয়। সুখশান্তি প্রাপ্তিতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে, জীবনে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন ধৈর্যশীল। বিখ্যাত নবি হযরত ইবরাহিম (আ.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্তি প্রতীক। জালিম শাসক নমরুদের মূর্তি পূজার বিরোধিতা করায় তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিষ্কিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চান নি। এমনিভাবে হযরত আইয়ুব (আ.) ও কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর দেহে পচন ধরেছিল। শরীর থেকে গোশত খসে পড়েছিল। আত্মায়সজন তাঁকে

ত্যাগ করেছিল। তাঁর সন্তানদি মারা গিয়েছিল। তাঁর ঘরবাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এমন কঠিন মুহূর্তেও তিনি দৈর্ঘ্যহারা হননি। আমাদের নবি হয়রত মুহাম্মদ (স.)ও দৈর্ঘ্যের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল অতুলনীয়। তাঁকে হত্যার ঘড়্যন্ত করা হয়েছিল তবু দৈর্ঘ্য হারাননি। সকল বিপদেই তিনি ছিলেন অটল ও অবিচল।

শরিয়তের বিধান পালন করতেও দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, রম্যান মাসের সিয়াম পালন, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হজ সম্পাদন, সঞ্চিত সম্পদের চান্দুশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচুর দৈর্ঘ্যধারণ করতে হয়।

এমনিভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে দৈর্ঘ্যধারণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা সকল বিপদাপদে দৈর্ঘ্যধারণ করব। বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করব। আমরা দৈর্ঘ্যশীল হব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে দৈর্ঘ্যধারণের সুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং উপস্থাপন করবে।

### পাঠ ৩

## ভাত্ত ( ভুক্তী )

### পরিচয়

উত্তোলন শব্দের আভিধানিক অর্থ ভাত্ত। পরম্পরের মধ্যে হৃদয়তা ও আন্তরিকতার সম্পর্ককে ভাত্ত বলে। মানুষের মাঝে এ হৃদয়তা ও আন্তরিকতা বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে।

ভাত্তকে তিনি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

১. ঔরসজাত ভাত্ত,
২. বিশ্বভাত্ত এবং
৩. ইসলামি ভাত্ত।

### ঔরসজাত ভাত্ত

একই পিতার ঔরসে বা একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করার কারণে যে ভাত্ত সৃষ্টি হয় তাকে ঔরসজাত ভাত্ত বলে।

### বিশ্বভাত্ত

পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা হয়রত আদম (আ.) ও আদি মাতা হয়রত হাওয়া (আ.)। এ কারণে বিশ্বের সকল মানুষই ভাই ভাই। ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি এবং বর্ণ ও ভাষার মধ্যে ভিন্নতা

দেখা দেয়। আর এভাবে মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবু তারা পরম্পরার ভাই ভাই। কারণ তারা সবাই এক আদম (আ.) হতে সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেন,

يَٰٰيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَّاُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِيلَ لِتَعْبَارُ فُؤُادًا

অর্থ : “হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে।”  
(সূরা আল-হজুরাত, আয়াত: ১৩)

রাসূল (স.) বলেছেন, “তোমরা প্রতিকেই আদম (আ.) হতে এবং আদম মাটি হতে সৃষ্টি।” (মুসনাদে আহমাদ)  
এ আয়াত ও হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে সকল মানুষ ভাত্তের বন্ধনে আবদ্ধ।

### ইসলামি ভাত্ত

আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম, ইসলামের মূলবাণী-আল্লাহ ছাড়া কোনো মাঝুদ নাই হয়রত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল। যারা এই কালিমায় বিশ্বাসী তারা যেকোনো বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও অঞ্চলের অধিকারী হোক না কেন, তারা ইসলামি ভাত্তের বন্ধনে আবদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَانُهُ

অর্থ : “নিশ্চয়ই মুমিনগণ ভাই ভাই।” (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত: ১০)

হাদিসে রাসূল (স.) বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

অর্থ: “মুসলমান মুসলমানের ভাই।” (বুখারি ও মুসলিম)

### ইসলামি ভাত্তের তাৎপর্য

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। ইসলামে উচ্চ-নিচু, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর বিশ্বের সকল মুসলমান পরম্পরারে ভাই। একই দীনসূত্রে আবদ্ধ। মহানবি (স.) বলেন, “অনারবগণের উপর যেমন আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি আরবগণের উপরও অনারবগণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।” ইসলামি ভাত্ত এতই সুদৃঢ় যে, আল্লাহর রাসূল (স.) পৃথিবীর সকল ইমানদারগণকে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন। দেহের কোনো একটি অঙ্গে অসুখ হলে যেমন পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি পৃথিবীর কোনো একপ্রাণ্তে

একজন মুসলিম বিপদে পতিত হলে সকল মুসলমানের অন্তর ব্যথিত হয়। কোনো মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এমনকি যদি কখনো পরম্পরের মধ্যে কোনো কলহ সৃষ্টি হয় তখন অপর মুসলমান ভাইয়েরা তা মিটিয়ে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। কোনো মুসলমান নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করবে অন্যথায় সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না। প্রিয় নবি (স.) বলেন, “মুমিনগণ পরম্পর মিলে একটি ইমারতস্বরূপ, এর এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে রাখে।” (বুখারি ও মুসলিম)

আমরা পরম্পর ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকব। সুখে-দুঃখে একে অপরের সঙ্গে শরিক থাকব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ইসলামি ভাতৃত্বের সুফলগুলো লিখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ৪

### নারীর মর্যাদা (*شَرْفُ النِّسَاءِ*)

#### পরিচয়

ইসলামে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর আদি পুরুষ হ্যরত আদম (আ.) এবং আদি নারী বিবি হাওয়া (আ.)। আর এ দুইজন থেকে পৃথিবীর সকল নর-নারীর সৃষ্টি। ইসলামে নর ও নারী উভয়ের সমমর্যাদা স্বীকৃত। মাতা, কন্যা, ভগী, স্ত্রী প্রভৃতি হিসেবে সমাজে নারীদের যে বিশেষ অধিকার ও স্থান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করলে নারীর মর্যাদা সম্মুক্ত হবে।

#### ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য না করে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল করুণ। সেখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হতো। কোনো কোনো সম্প্রদায় কন্যাসন্তানকে জীবিত করব দিত।

কুরআন মজিদে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- “তাদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সন্ত্রেণ সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট।” (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯)

মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের পর নারী ফিরে পায় স্বীয় মর্যাদা। মহানবি (স.) একজন সাহাবীকে তাঁর মায়ের ব্যাপারে বলেছেন, ‘জাল্লাত তাঁর দু’পায়ের নিচে।’ (নাসাই)

নবি করিম (স.)-এর একটি হাদিসে পিতা অপেক্ষা মায়ের অধিকার বেশি বলে উল্লেখ আছে। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে নারী পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

অর্থ : “নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোনো আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা একে অপরের অংশ।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫)

ইসলামে স্বামীর সৎসারে স্ত্রীর বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُنَّ لِبَاسٌ لِكُفَّافٍ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

অর্থ : “তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা (স্বামীরা) তাদের ভূষণ।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭)

মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ: “আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৮)

নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার ব্যাপারে মহানবি (স.) বিদায় হজের ভাষণে বলেন,

অর্থ : “তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তাদের গ্রহণ করেছ।” (তাফসিলে তাবারি)

সম্পত্তি লাভের বেলায়ও ইসলাম নারীকে পিতা ও স্বামীর উভয়ের সম্পত্তির অধিকারিণী করেছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যার্জন এবং অর্থ উপার্জনে ইসলাম নারীদের অনুমতি দান করেছে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায় যে, পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর উত্তরাধিকারসূত্রে যা প্রাপ্ত তা থেকে নারীদের বর্ধিত করার চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের কাজ কুরআন সুন্নাহর আলোকে হারাম। যারা এরূপ করবে পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আমরা এ পাঠে জানলাম

- ১। নারীর মর্যাদা।
- ২। নারীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মহানবি (স.)-এর তাগিদ।

আমরা নারীসমাজকে যথাযথ মর্যাদা দেব। তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন থাকব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ইসলাম কীভাবে নারীদের মর্যাদা দিয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

## পাঠ ৫

### সমাজসেবা (خدمة المجتمع)

#### পরিচয়

সমাজের বৃত্তিতে জনগোষ্ঠীর কল্যাণে স্বেচ্ছায় গৃহীত কাজকে সমাজসেবা বলে। ব্যাপক অর্থে মানবকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল কর্মসূচিই সমাজসেবা নামে পরিচিত।

#### তাৎপর্য

সমাজে নানা শ্রেণি ও পেশার লোক বাস করে। তারা সকলে সমান নয়। তাদের সুযোগ-সুবিধাও সমান নয়। কেউ বিপুল সম্পদের অধিকারী আবার কেউ কপর্দিকহীন। সম্পদশালী ব্যক্তিগণ অভাবী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নেও তাদের সম্পদ ব্যয় করবে। সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠান গড়বে। এটাই ইসলামের নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন-

وَقِنِ آمُوا لِهِمْ حَقٌّ لِلَّهِ أَعْلَمُ وَالْمَحْرُومُ  
○

অর্থ : “এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বৰ্ধিতের হক।” (সূরা আয়-যারিয়াত, আয়াত: ১৯)

অর্থশালী ব্যক্তি সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণে এমন প্রতিষ্ঠান গড়বে, যে প্রতিষ্ঠানে অভাবী লোকেরা কাজ করে তাদের আর্থিক সমস্যার সুরাহা করবে। বাঁচার অবলম্বন খুঁজে পাবে। গ্রামের উন্নয়নের বিরাট বাধা দূর করার জন্য গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাসহ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সমাজসেবামূলক কাজ।

সমাজকে অশিক্ষা ও নিরাক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন-

إِقْرَأْ بِاِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  
○

অর্থ : “পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১)

হাদিসে বলা হয়েছে—

ظَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ—

অর্থ : “জ্ঞান অব্দেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরাজ।” (বায়হাকি)

সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর হবে। সমাজ সংশোধনমূলক প্রতিটি কার্যক্রমই সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। সমাজে কোনো বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ সৃষ্টি হলে তা দূর করতে হবে। কারণ বিশৃঙ্খলা সমাজের পরিবেশকে নষ্ট করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

**وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنِ الْقَتْلِ ۝**

অর্থ : “ফিত্না (বিশৃঙ্খলা) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯১)

সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা করা, পরম্পরারের কলহ ও দ্বন্দ্ব মেটানো সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন- “মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিঙ্গ হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।” (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত ৯)

সর্বস্তরের জনগণের উপকারে আসে এমন সব কাজের অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই করা দরকার। যেমন- ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত করা, নতুন রাস্তা নির্মাণে সাহায্য করা, পুল-সাঁকো নির্মাণ করা, বৃগৎ ব্যক্তির সেবা করা, আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌছে দেওয়া, রাস্তার পাশে ছায়াদার বৃক্ষ রোপণ করা, বৃক্ষ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

জনসেবা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য লাভ করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “আল্লাহ বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।” (মুসলিম)

আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে-

**سَيِّئُ الْقَوْمٍ خَادِمُهُمْ ۔**

অর্থ : “জাতির নেতা তিনিই যিনি তাদের সেবক।”

সমাজ সেবা মানবিক দায়িত্ব। আমরা সমাজের সেবা করব। সমাজকে ভালো করে গড়ে তুলব। সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব। মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সমাজসেবা করব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সমাজসেবামূলক কাজের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ৬

### দেশপ্রেম ( حُبُّ الْوَطَنِ )

#### পরিচয়

জন্মভূমির প্রতি মানুষের অন্তরে একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং ভালোবাসা জন্মায়। ক্রমান্বয়ে এ আকর্ষণ বা ভালোবাসা বিস্তৃতি লাভ করে সমগ্র দেশ, দেশের মাটি ও দেশের জনগণের প্রতি। মাতৃভূমি তথা দেশের প্রতি এ প্রীতি ও দরদের আকর্ষণকেই দেশপ্রেম বলে।

দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। দেশপ্রেমের মূলেই আছে দেশের ভূখণকে ভালোবাসা।

দেশের জনগণকে ভালোবাসা, দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি-নীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা কর্তব্য।

### গুরুত্ব

দেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম দেশপ্রেমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহানবি (স.) তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, মক্কার অধিবাসীদের ভালোবাসতেন। তাদের হিদায়াতের জন্য তিনি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেন। কাফিরদের অত্যাচারে সাহাবিগণকে মহানবি (স.) আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেও তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে কাফিরদের কঠিন ঘড়যন্ত্রের কারণে এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন মক্কার দিকে বার বার ফিরে তাকান, আর কাতর কঁচে বলেন-

“হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার আপন গোত্রীয় লোকেরা যদি ঘড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।”

সাহাবিগণও স্বদেশ মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন। মদিনায় হিজরতের পর হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত বিলাল (রা.) কঠিন জুরে আক্রান্ত হন। তখন তাঁরা মক্কার তৃণলতা, পাহাড়-পর্বত এবং পানির কথা স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণের এ অবস্থা দেখে বলেন,

“হে আল্লাহ! আমরা মক্কাকে যেরূপ ভালোবাসি, তদূপ অথবা তার চেয়েও অধিকভাবে আপনি আমাদের অন্তরে মদিনার প্রতি ভালোবাসা দান করুন।” (বুখারি)

দেশপ্রেম মানুষকে দেশ রক্ষায় উদ্বৃক্ত করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমিক নিজের জানমাল উৎসর্গ করতেও কুর্তাবোধ করে না।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “দেশরক্ষায় একদিন এক রাতের প্রহরা (রিবাত) ক্রমাগত এক মাসের রোয়া এবং সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম।” (মুসলিম)

দেশপ্রেম মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করে তোলে। দেশের উন্নতিসাধনে সজাগ রাখে। দেশের সম্পদ সংরক্ষণে উদ্বৃক্ত করে।

আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব, দেশের উন্নতি করব। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে দেশকে কীভাবে ভালোবাসা যায় তা আলোচনা করবে।

## পাঠ ৭

### পরমতসহিষ্ণুতা

#### পরিচয়

পরমত বলতে বুঝায় অপরের মত, পথ বা আদর্শ, সেটা ধর্মীয় হতে পারে এবং আদর্শিকও হতে পারে। আবার রাজনৈতিকও হতে পারে। অন্যের মতামতকে অবজ্ঞা না করে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া বা অন্যের মত বা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে।

অন্যের ধর্মীয় মতামত বা রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে। পরমতসহিষ্ণুতা মানবচরিত্রের প্রশংসনীয় গুণ। এ গুণটির কারণেই সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। এ গুণটির কারণেই মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সন্তাব বজায় থাকে। সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সন্তাব বজায় থাকে।

#### গুরুত্ব

#### পারিবারিক শান্তি লাভ

একটি সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবনের জন্য পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি এর উপর নির্ভরশীল। পরিবারের অন্য সদস্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করার মাধ্যমে পারিবারিক শান্তি লাভ করা যায়।

#### সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

পারিবারিক সুখ-শান্তির মতো সামাজিক সুখ-শান্তি ও পরমতসহিষ্ণুতার উপর নির্ভরশীল। সমাজে বিভিন্ন মতাদর্শের লোক থাকতে পারে, তাদের সাথে সমরোতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। তাদের মতের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করলে শান্তি বজায় থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মতামত ও আদর্শের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। তাহলেই সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

#### রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা

পরমতসহিষ্ণুতার উপর রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলা নির্ভরশীল। একটি দেশে নানা ধর্ম, বর্ণ ও মতের লোক বসবাস করে। তাদের মধ্যে পারম্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি, সমরোতা ও সহাবস্থানের জন্য পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য।

## আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা

পরমতসহিষ্ণুতার কারণেই আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর অভাবে পারম্পরিক সহাবস্থান কঠিন হয়ে যায়। আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক লাভের প্রধান পূর্বশর্ত পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ। ভিন্ন দেশ ও সমাজের আদর্শ, রীতিনীতি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন ও পারম্পরিক ব্রার্থরক্ষা সম্ভব হয়।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পরমতসহিষ্ণুতার সুফলগুলোর একটি তালিকা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

## পাঠ ৮

### আখলাকে যামিমাহ (أَلْخَلَاقُ الْمِيَمَّةُ)

#### পরিচয়

যে খারাপ কাজ বা আচরণ মানুষকে হীন ও নিন্দনীয় করে তোলে তাকে আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন— অহংকার, ঘৃষ্ণ, অশ্রীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি।

#### অপকারিতা

আখলাকে যামিমাহ এর কারণে ওইসব ব্যক্তি সমাজ জীবনে নিন্দনীয় হয়। তারা মানুষের ভালোবাসা থেকে বধিত হয়। তাদের দ্বারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিহ্বিত হয়। অন্যায় ও অসৎ কাজের প্রসার ঘটে। তারা আল্লাহ ও রাসুলের অপ্রিয় হয়। এর ফলে তারা পরকালে জাল্লাত থেকে বধিত হবে।

তাই আমাদের সকলকে আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র থেকে দূরে থাকতে হবে। এর ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, পরিবেশ হবে সুন্দর, মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করা সম্ভব হবে।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আখলাকে যামিমাহ এর অপকারিতা সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

## পাঠ ৯

### অহংকার (الْكِبْرُ)

#### পরিচয়

অহংকার শব্দের অর্থ অহমিকা, আমিত্তি, গর্ব, দর্প, দম্পত্তি, বড় ভাবা ইত্যাদি। নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় গণ্য করা এবং অন্যকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করাকে অহংকার বলা হয়। যে অহংকার করে তাকে অহংকারী বলে। অহংকারী ব্যক্তি বিভিন্ন দিক থেকে নিজেকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয় এবং নিজেকে অন্যদের তুলনায় উন্নত মনে করে।

#### অহংকারের ধরন তিনটি

১. অঙ্গের অহংকার পোষণ করা।
২. চালচলন ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করা।
৩. কথাবার্তায় অহংকার প্রকাশ করা।

মানুষ বৎশ, সম্পদ, সৌন্দর্য, শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে অহংকার করে থাকে। যেমন ধনী ও সম্পদশালীর মধ্যে অর্থের গৌরব, স্ত্রীলোকদের মধ্যে সৌন্দর্যের বড়াই এবং ক্ষমতাবানদের মধ্যে ক্ষমতার দম্পত্তি, বিদ্঵ান লোকদের মধ্যে বিদ্যার গর্ব ইত্যাদি।

#### অপকারিতা

অহংকারের কুফল অনেক এবং এর অপকারিতা বর্ণনাতীত। অহংকারের কারণেই ইবলিস অভিশঙ্গ হয়ে জাগ্রাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী :

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَإِنْ هُوَ إِلَّا جُنُونٌ لِّأَنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ○

“তুমি এ স্থান হতে নেমে যাও। এ স্থানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অধমদের অস্তর্ভুক্ত।” (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৩)

অহংকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আধিরাতে ঘৃণিত। আল্লাহর কাছে অপছন্দণীয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ○

অর্থ : “নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধৃত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।” (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৮)

মহানবি (স.) এ বিষয়ে বলেন,

لَا يَدْخُلُ أُجْنَّةً مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّةٌ مِّنْ كَبْرٍ -

অর্থ : “যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে, সে জাগ্রাতে প্রবেশ করবে না।” (মুসলিম)

প্রতিটি মানুষের কোনো না কোনো অভাব আছে। সুতরাং অহংকার করা তার জন্য শোভা পায় না।

অহংকার শুধু তাঁরই শোভা পায়, যার কোনো অভাব নেই। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

“আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, অহংকার আমার ভূষণ।” (আবু দাউদ)

আমরা অহংকার বর্জন করব। কেননা মানুষের কোনো জিনিস নিয়েই অহংকার করার অবকাশ নেই।

আমরা এ পাঠে শিখলাম, অহংকার পতনের মূল। অহংকারী অভিশঙ্গ। আমরা অহংকার করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কী কী কাজ করলে অহংকার প্রকাশ পায় তার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ১০

### অশ্লীলতা (الْبَذَائِةُ)

#### পরিচয়

অশ্লীলতা অর্থ জগন্যতা, কদর্যতা, নির্বজ্ঞতা, অভদ্রতা ও যৌন বিষয়ক কৃৎসিত আচরণ। অশ্লীলতার দ্বারা নির্বজ্ঞ ও কুরুচিপূর্ণ কথা ও কাজকে বোঝানো হয়। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টাসহকারে প্রকাশ্যে করা হয় সেগুলোকেও অশ্লীল বলা হয়।

#### কৃফল

অশ্লীলতা একটি বড় অপরাধ। এটা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। সমাজকে কল্যাণিত করে। নিষ্পাপ ও কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র হনন করে যুবক-যুবতীদের কুকর্মের প্রতি অপ্লুক করে।

আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

“ব্লুন, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।” (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৩৩)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

“প্রকাশ্য কিংবা গোপন অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না।” (সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৫১)

অশ্লীল আচরণকারী সকলের নিকট ঘৃণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

“যার মধ্যে অশ্লীলতা আছে, তা তাকে ত্রুটিশুভ্র করে। আর যার মধ্যে লজ্জাশ্লীলতা আছে, তা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।” (তিরমিয়ি)

ফর্মা নং-১৩, (ইসলাম শিক্ষা, ৮ম শ্রেণি)

অশ্লীলতা মানুষের পারলোকিক জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-

أَنْجِنَةُ حَرَامٍ عَلَى كُلِّ فَاجِشٍ أَنْ يَدْخُلَهَا

অর্থ : “গ্রন্তেক অশ্লীল আচরণকারীর জন্য জাহাতে প্রবেশ হারাম।” (কানযুল উম্মাল)

অশ্লীলতা ত্যাগ করা মুমিন বান্দার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يَعْتَزِزُونَ كَبَائِرُ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

অর্থ : “তারাই (মুমিন) যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে।” (সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩৭)

### প্রতিকার

১. ইসলামের নীতি ও আদর্শের অনুশীলন,
২. পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং
৩. সচেতনতার পাশাপাশি আইনি প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্রষ্টান্তমূলক শান্তির ব্যবস্থা করা।

অশ্লীল কথা, কর্ম ও অপরাধকে সবাই ঘৃণা করে। অশ্লীলতা, অসভ্যতা ও বর্বরতার প্রতীক। অশ্লীল আচরণ ও কর্ম থেকে আমরা বিরত থাকব, অন্যকেও বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অশ্লীলতার প্রতিকার সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ১১

### পরশ্রীকাতরতা (الحسدُ)

পরশ্রীকাতরতা অর্থ অন্যের উন্নতি ও সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা প্রকাশ করা। অর্থাৎ কারো ধন-দৌলত, সম্মান, ভালো ফল বা উচ্চ মর্যাদা দেখে ঈর্ষার্থিত হওয়া এবং তার ধৰ্মস কামনা করাকে পরশ্রীকাতরতা বলা হয়।

### কুফল

পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি বহু কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন শত্রুতা, অহংকার, নিজের অসদুদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি। এসব কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা বিদ্বেষ করে থাকে। ইসলাম এ কাজগুলো হারাম ঘোষণা করেছে। পরশ্রীকাতরতার অপকারিতা সীমাহীন। হযরত আদম (আ.)-এর পদমর্যাদা দেখে ইবলিস তার প্রতি ঈর্ষার্থিত হয়। ফলে সে অভিশঙ্গ হয় এবং আল্লাহ তায়ালাৰ দয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

মানব সৃষ্টির পর ঈর্ষার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল পরশ্চীকাতরতার বশবর্তী হয়ে তারই আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। পরশ্চীকাতরতা মানুষের পুণ্য কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন,

إِنَّ الْحَسَدَ يَا كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ اخْتَطِبْ

অর্থ : “আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জুলিয়ে ছাই করে দেয় পরশ্চীকাতরতা তেমনই পুণ্যকে ধ্বংস করে দেয়।” (ইবনু মাজাহ)

পরশ্চীকাতরতা মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে। মনে অশান্তির আগুন জুলিয়ে রাখে। পরশ্চীকাতর ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। সমাজের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে। পরশ্চীকাতরতা সমাজে ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি ও অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে পরশ্চীকাতরতা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

○ وَمَنْ شَرِّ حَاسِبٌ إِذَا حَسَدَ

অর্থ : “আর হিংসুকের (পরশ্চীকাতরতার) অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।” (সূরা আল-ফালাক, আয়াত: ৫)

আল্লাহ তায়ালা হিংসা বর্জনকারীকে ভালোবাসেন। হিংসা বর্জনকারী জাল্লাত লাভ করবেন। প্রিয় নবি (স.) একবার তার এক সাহাবিকে জাল্লাতি বলে ঘোষণা দেন। তিনি কী আমল করেন এ সম্পর্কে জিজেওস করা হলে, তিনি (সাহাবি) বলেন আল্লাহ তায়ালা যাকে কোনো উন্নত বন্ধু দান করেছেন আমি তার প্রতি কথনই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনু মাজাহ)

### আমাদের প্রতিজ্ঞা

আমরা পরশ্চীকাতর হব না। নিজের পতন নিজে ডেকে আনব না। হিংসা করব না। সমাজের শান্তি বিনষ্ট করব না।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা পরশ্চীকাতরতার কুফলের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবে।

## পাঠ ১২

### ঘৃণা (البغض)

#### পরিচয়

ঘৃণা অর্থ অবজ্ঞা, অপছন্দ, উপেক্ষা, তাচিল্য, তুচ্ছ জ্ঞান করা। কাউকে তুচ্ছ মনে করে তাকে সহ্য করতে না পারা এবং তার থেকে দূরে সরে থাকাকেই পরিভাষায় ঘৃণা বলে।

অহংকার, শত্রুতা, পদমর্যাদার লিঙ্গা প্রভৃতি কারণে ঘৃণার উদ্দেশ্য ঘটে। ঘৃণা করা অন্যায় তবে ক্ষেত্রবিশেষ ঘৃণা একটি মানবীয় গুণ। যেমন মন্দ কাজে ঘৃণা করা প্রশংসনীয়। সমাজে চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, সুদ, ঘূষ, মদ, জুয়া, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, হেরোইন সেবন ইত্যাদি ঘৃণিত কাজ। এগুলোকে ঘৃণা করা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। তবে মনে রাখতে হবে পাপ কাজকে ঘৃণা করব পাপীকে নয়।

#### কুফল

অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণা একটি মহা গুরুতর ব্যাধি। এতে বদ্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। ঘৃণাকারী কখনো মনে শান্তি লাভ করতে পারে না। এতে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি সাধিত হয়।

মহানবি (স.) বলেন, **دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمِمِ قَبْلَكُمْ أَخْسَلُوهُ الْبَغْضَاءُ**

অর্থ: “পূর্ববর্তী উম্মাতের দুটি রোগ তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে, হিংসা এবং ঘৃণা।” (তিরমিয়ি)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, “তোমরা একে অপরকে হিংসা করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না, একে অন্যের ক্ষতি করার জন্য কৌশল করো না বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরম্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।” (রুখারি ও মুসলিম)

ঘৃণা বা তাচিল্য শয়তানের বৈশিষ্ট্য। শয়তান হ্যরত আদম (আ.)-এর প্রতি তাচিল্য করার কারণেই অভিশপ্ত হয়েছে। আমরা কাউকে ঘৃণা করব না।

আমরা ঘৃণার কুফল উপলক্ষ্মি করব। সকলের প্রতি উদার হব। ভালো কাজে প্রশংসা করব। অর্থ, বিদ্যা বা সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিতে কাউকে ঘৃণা বা হেয় করব না। তবে মন্দ কাজকে ঘৃণা করব। মন্দ কাজকে ঘৃণা না করলে সমাজে তা ধীরে ধীরে বৈধ বলে পরিগণিত হয়।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ঘৃণার কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

## পাঠ ১৩

### চুরি (السرقة)

#### পরিচয়

কারো মালিকানাভূক্ত সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে হাতিয়ে নেয়ার নাম চুরি।

#### চুরির কুফল

##### নিরাপত্তাইনতা

চুরির জন্য সম্পদ ও জীবন নিরাপত্তাইনতার শিকার হয়। কারণ কখনো কখনো চোর ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মালিককে খুনও করে।

##### সামাজিক শান্তি বিনষ্ট

চুরির কারণে মানুষ শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। সম্পদ পাহারা দিতে নির্যুম রাত কাটাতে হয়। সর্বদা সম্পদ চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সামাজিক শান্তি ও স্বন্তি বিনষ্ট হয়।

##### সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি

চুরির দ্বারা সমাজে আরও নতুন নতুন অপরাধ সৃষ্টি হয়। চোর শুধু তার কাজ চুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না বরং সে, ছিনতাই, অপহরণ, খুন এবং মাঝে মাঝে সন্ত্রমহানির ঘটনাও ঘটায়।

##### চুরি একটি ঘৃণিত কাজ

চুরি সমাজের নিন্দনীয় কাজগুলোর অন্যতম। সমাজে চোরকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। চোরকে মানুষ আত্মীয় হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। পরিবার ও সমাজের লোকেরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

##### পরকালীন শান্তি

চুরি একটি অত্যন্ত জগন্য ধরনের নিষিদ্ধ কাজ। এর ফলে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন থাকতে পারে না। আল্লাহ তার জন্য পরকালেও ভয়াবহ শান্তির অঙ্গীকার করেছেন।

##### চুরি প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

চুরির জন্য পরকালে শান্তির অঙ্গীকার ছাড়াও এ অনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য ইসলাম পার্থিব দণ্ডবিধানও দিয়েছে।

##### প্রতিকার

###### ১. মৌলিক প্রয়োজন মেটানো

কেউ যাতে অন্ন, বস্ত্র বা মৌলিক চাহিদার অভাবে চুরি না করে তার জন্য সেসবের ব্যবস্থা করতে হবে। তার কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

## ২. দৃষ্টান্তমূলক শান্তির ব্যবস্থা

অভাব না থাকা সত্ত্বেও স্বভাবগত কারণে কেউ যদি চুরি করে তাহলে সব দেশ এবং সব সমাজেই সেজন্য শান্তির বিধান রয়েছে, ইসলাম ধর্মেও তার জন্য কঠিন শান্তির বিধান রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

**وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا آيُهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ**

অর্থ: “আর পুরুষ চোর আর মহিলা চোর তাদের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার দৃষ্টান্তমূলক শান্তি।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩৮)

## ৩. নেতৃত্বাবোধ জাগ্রত্করণ

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের অন্তরে চুরির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। চোরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার মাধ্যমে নেতৃত্বাবোধ জাগ্রত করা।

### ধর্মীয় প্রতিকার

চুরি শুধু সামাজিক অপরাধই নয়, ধর্মীয় বিবেচনায় একটি হারাম কাজ। দুনিয়ায় ঘৃণা ও শান্তি ছাড়াও আখিরাতে এর জন্য কঠোর শান্তির বিধান রয়েছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে চুরি প্রতিকারের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

## পাঠ ১৪

### যুষ ( أَلْرِشُوْةُ )

#### পরিচয়

যুষ অর্থ উৎকোচ। এর আরবি প্রতিশব্দ ‘রেশওয়াত’। অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিকই যুষ। কর্তব্যরত কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়া যুক্তের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে উপটোকন গ্রহণ করাও যুষ। রাসুলল্লাহ (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল, আর এ সুপারিশের প্রতিদানস্বরূপ তাকে কিছু উপহার দেওয়া হলে, সে যদি তা গ্রহণ করে, তবে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হবে।” (কিতাবুল কাবায়ির)

#### কুফল

যুষ একটি সামাজিক অপরাধ। যুষ লেনদেনের মাধ্যমে অন্যের অধিকার স্ফূর্ণ হয়। যুষ গ্রহীতাকে সকলে ঘৃণা করে। যুষ গ্রহণ এবং দেওয়া দুটিই পাপ কাজ। যুষ গ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ বর্ষিত হয়। রাসুলল্লাহ (স.) বলেন,

**لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِنِ وَالْمُرْتَشِيِ -**

অর্থ: “ঘূষ দাতা ও ঘূষ গ্রহীতার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।” (ইবনু মাজাহ)

ঘূষ দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই অমার্জনীয় অপরাধ। ঘূষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহানামি। রাসুল (স.) বলেন,

**الرَّاشِنُ وَالْمُرْتَشِنُ كَلَاهُمَا فِي النَّارِ -**

অর্থ: “ঘূষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহানামি।” (তাবারানি)

কোনো কর্মচারী তার বেতনের অতিরিক্ত জনগণ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা অবৈধ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “কোনো ব্যক্তিকে যদি আমরা কোনো কাজে নিয়োগ করি এবং এ জন্য তাকে বিনিময় দান করি, আর সে বিনিময়ের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে তা খিয়ানত হিসাবে গণ্য হবে।” (আবু দাউদ)

### ঘূষ প্রতিরোধে ইসলামি বিধান

ইসলাম ঘূষকে হারাম ঘোষণা করেছে। মুমিনদের ঘূষ আদান প্রদান না করার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে।

মহান আল্লাহ ঘূষের সম্পদকে হারাম ও অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। মুমিনদের দায়িত্ব হলো এ নিষিদ্ধ অপবিত্র কাজে অংশগ্রহণ না করা।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী,

“আপনি বলুন, হারাম ও অপবিত্র জীবিকা এবং পবিত্র জীবিকা সমান নয়। যদিও হারামের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে। কাজেই হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর- যাতে সফলকাম হতে পার।”  
(সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ১০০)

কিয়ামত দিবসে ঘূষ গ্রহীতার পরিণতি হবে খুবই লজ্জাজনক। মহানবি (স.) বলেছেন- “যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! ব্যক্তি যা ঘূষ হিসেবে গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়েই উপস্থিত হবে।”

সর্বেপরি মহানবি (স.) ঘূষদাতা ও গ্রহীতার জন্য জাহানামের সংবাদ দিয়েছেন।

আমরা সমাজকে ঘূষের অভিশাপ থেকে মুক্ত করব। নিজেরা কখনো ঘূষ আদান-প্রদান করব না।

সামাজিক অপরাধ হিসাবে এ অভিশপ্ত কাজ প্রতিরোধ করব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ঘূষের সামাজিক কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে  
এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৫

## সন্ত্রাস (الْأَلْرَهَابُ)

### পরিচয়

সন্ত্রাস হলো ফিতনা-ফাসাদের আধুনিক রূপ। সন্ত্রাস শব্দের অর্থ অতিশয় তাস বা ভয়ের পরিবেশ। অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে বা জোর খাটিয়ে মানুষের কাছ থেকে কিছু আদায় করা বা আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টির নীতিকে সন্ত্রাস বলে।

### সন্ত্রাসের কুফল

সন্ত্রাসের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। মানুষের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ব্যাহত হয়। সন্ত্রাসকবলিত জনপদে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। যখন তখন কেউ অপমৃত্যুর শিকার হতে পারে। সন্ত্রাসের কারণে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা থাকে না। সন্ত্রাসের নিরাপত্তা থাকে না। পারম্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। বিদ্যে বেড়ে যায়। আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসন স্থিবর হয়ে পড়ে। ফলে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি মারাত্কভাবে ব্যাহত হয়।

### সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

ইসলাম সন্ত্রাস প্রতিরোধে মুসলমানদের ঐক্যবন্ধ থেকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। আর এ যুদ্ধকে মুমিনদের ইমান রক্ষার যুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহর বাণী,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

অর্থ : “এবং তোমরা তাদের বিরক্তে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়।” (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৯)

সন্ত্রাস দমনে ইসলাম সাধারণত তিন প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে।

### ১. শান্তিমূলক ব্যবস্থা

সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত অপছন্দ করেন। মহান আল্লাহ সন্ত্রাসকে হত্যার চেয়ে জঘন্য আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنِ الْقَتْلِ

অর্থ: “আর ফিতনা (বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস) হত্যার চেয়ে জঘন্য।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯১)

যারা আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞার পরও বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় বা সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখবে, তাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, “যারা

আঢ়াহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধর্মসান্ত্বক কাজ করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে বিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩৩)

## ২. কারণ উদঘাটন ও নিরসন

ইসলাম সন্তানের কারণ উদঘাটন ও তা নিরসনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্য ইসলামে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও নৈতিক অবস্থার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি জোর দিয়েছে।

## ৩. নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ

জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামি বিধান কার্যকর করে ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে সন্তাস দূর করা যায়। নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সন্তাসী কাজকে ঘৃণা করা এবং সন্তাসীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার মাধ্যমে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা যায়।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সন্তানের কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ১৬

### এইচআইভি এবং এইডস

বর্তমান শতাব্দীর এক মহাআতঙ্কের নাম এইডস। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগেও এইডস বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি। এ রোগটি ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে ধরা পড়ে। যে ভাইরাস থেকে এ রোগটি হয় তার নাম Human Immune Deficiency Virus, এর সংক্ষিপ্ত নাম HIV- এটি একটি ঘাতক ব্যাধি। HIV দ্বারা কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে তাকে “এইচআইভি বহনকারী” হিসেবে চিহ্নিত Y করা হয়। এ ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে রক্তের রোগ প্রতিরোধকারী T4 কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এক পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমাগতে মৃত্যুর কোলে চলে পড়ে।

### এইচআইভি যেভাবে ছড়ায়

বয়স, জাতি, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবাই এইচআইভি দ্বারা সমানভাবে আক্রান্ত হতে পারে। এইচআইভি মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের তরল পদার্থের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। তরল পদার্থগুলো হলো রক্ত, বীর্য, মাতৃদুষ্ফুর ইত্যাদি। যদি এইচআইভি আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার শরীরের তরল পদার্থ কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে, তবে তিনি এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন।

এইচআইভি এবং এইডস যেসব কারণে ছড়ায় তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো—

- ক. আবেদ মেলামেশা।
- খ. মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সিরিঞ্জের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো।
- গ. অপরিশোধিত রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো।

### প্রতিরোধের উপায়সমূহ

১. সুস্থ বৈবাহিক জীবনযাপন করা।
২. নারী-পুরুষের আবেদ মেলামেশা এড়িয়ে চলা।
৩. মাদক ও নেশা জাতীয় সকল জিনিস বর্জন করা।
৪. অপরিশোধিত রক্ত শরীরে প্রবেশ না করানো।

আমরা ইসলামি বিধিবিধান মেনে চলব। সামাজিক অপরাধসমূহ এড়িয়ে চলব। আমরা নিজেকে এবং সমাজকে সকল অপরাধ ও রোগসংক্রমণ থেকে রক্ষা করব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর

১. সন্তানের বেহেশত —— পদতলে।
২. ধৈর্য মানবজীবনের একটি ——।
৩. —— একটি বড় অভিশাপ।
৪. জাতির নেতা তিনিই, যিনি তাদের ——।
৫. যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে সে —— প্রবেশ করবে না।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আল্লাহ কোনো উদ্দত অহংকারীকে	মানসিক ব্যাধি
২. অশ্লীল আচরণকারী	গুরুতর
৩. পরশ্চীকাতরতা একটি মারাত্মক	ভাই ভাই
৪. ফিত্না (বিশৃঙ্খলা) হত্যা অপেক্ষা	সকলের নিকট ঘৃণিত
৫. নিশ্চয়ই মুমিনগণ	পছন্দ করেন না

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সদাচরণ বলতে কী বোঝায়?
২. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়?
৩. অশ্লীলতা কী? সংক্ষেপে লেখ।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।
২. ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
৩. সন্ত্রাস প্রতিকারের উপায় কী? বর্ণনা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আত্মকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
  - ক. দুই
  - খ. তিন
  - গ. পাঁচ
  - ঘ. সাত
২. সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত হলো-
  - i. সমাজ ও জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
  - ii. সমাজের অধিবাসীদের দন্ত মেটানো
  - iii. দেশ রক্ষায় অংশগ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আবদুর রহমান সাহেব অফিসের বড় কর্তা। দীর্ঘদিন কাজ করার কারণে অভিজ্ঞও বটে। সহকর্মীগণ ছোট কোনো ভুল করলে তিনি রেগে যান এবং অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করেন। এজন্য তিনি কখনো অনুশোচনাও করেন না।

৩. আবদুর রহমান সাহেবের কাজটি কিসের প্রতীক?

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ক. ঘৃণার     | খ. অহংকারের |
| গ. অন্যায়ের | ঘ. অসভ্যতার |

৪. শরিয়ত অনুযায়ী আবদুর রহমান সাহেবের কাজটির পরিণতি কী?

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ক. জনগণের ঘৃণা লাভ      | খ. নিশ্চিত পতন       |
| গ. সমাজের শান্তি বিনষ্ট | ঘ. নতুন অপরাধ সৃষ্টি |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. নাইম সাহেব পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি কৃষি খামার স্থাপন করেন। খামারে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়েছে। নাইম সাহেবের খামারের ফসলের ফলন দেখে তার প্রতিবেশী শিশির সাহেব মনে কষ্ট অনুভব করলেন। ফসল কাটার পূর্বেই এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবাড়ে নাইম সাহেবের খামারের অধিকাংশ ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়। এতে শিশির সাহেব খুশি হলেন। কিন্তু নাইম সাহেবের খামার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তিনি একটুও বিচলিত হননি। তিনি বললেন, এটা আল্লাহর পরীক্ষা। আমি আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাই।

ক. ঘৃণার আরবি প্রতিশব্দ কী?

খ. অহংকার বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. শিশির সাহেবের আচরণ আখলাকে যামিমার কোন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “নাইম সাহেবের মনোভাবটির সঠিকতা” পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২. আকরাম সাহেব দৌলতপুর গ্রামে বসবাস করছেন। তিনি কিছুদিন ধরে লক্ষ করছেন এ এলাকায় ৬/৭ জন যুবকের একটি দল লোকজনকে নানাভাবে নাজেহাল করছে। তাদের এতই প্রভাব যে তাদেরকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। বিভিন্ন ব্যবসায় গ্রাহিতান থেকে তারা অনৈতিকভাবে টাকা তুলছে। তারা এলাকার মেয়েদের স্কুল-কলেজে আসা যাওয়ার পথে কঢ়ুকি করে। তাদের এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনার উপায় খুঁজে বের করার জন্য আকরাম সাহেব এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব ও অন্য মুরবিবদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন।

ক. এইচআইভি (HIV) এর পূর্ণরূপ কী?

খ. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়?

গ. দৌলতপুর গ্রামের কয়েকজন যুবকের কর্মকাণ্ডকে কী বলা যায়? বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের ‘যুবকদের কর্মকাণ্ড হত্যার চেয়েও জঘন্য’-বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

## পঞ্চম অধ্যায়

### আদর্শ জীবনচরিত

মহান আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর বিধিনিষেধ মান্য করা। আর এসব বিধিনিষেধ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অবশ্যই একটি অনুসরণীয় নীতিমালা প্রয়োজন। যাকে আমরা আদর্শ বলতে পারি। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত নবিগণের জীবনচরিত আমাদের আদর্শ। এর মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনচরিত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এমনিভাবে যাঁরা নবি ও রাসূলগণের জীবনী অনুকরণ করে ধন্য হয়েছেন তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলোকেও আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করব।

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আদর্শ জীবনচরিতের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারব এবং তাঁদের গুণাবলি বাস্তব জীবনে প্রতিফলনে আগ্রহী হব।
- হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মুক্তি বিজয়ের প্রেক্ষাপট, মুক্তি বিজয়, উদারতা, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভাতৃত্ব বন্ধন, বিদায় হজের ভাষণ ও আদর্শ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব এবং মহানবি (স.) এর আদর্শ বাস্তব জীবনে প্রতিফলনে উৎসাহী হব।
- হযরত আয়েশা (রা.)-এর পরিচয়, শিক্ষাজীবন, ইফকের ঘটনা, শিক্ষায় অবদান, শিক্ষকতা, গুণাবলি ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারব এবং বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে উদ্বৃদ্ধ হব।
- হযরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজ (র.) ও হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারব ও অনুসরণে আগ্রহী হব।
- বাস্তব জীবনে মনীষীগণের গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বৃদ্ধ হব।
- দলগতকাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে পারব এবং সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানে আগ্রহী হতে পারব।

## পাঠ ১

### হযরত সুলায়মান (আ.)

#### পরিচয়

হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর প্রসিদ্ধ নবি ছিলেন। তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৯৭৫-৯৭০ এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। যে চারজন বাদশাহ সমস্ত পৃথিবীর শাসক ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁদের একজন। তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পর তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আ.) ইস্তিকাল করেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে নবি হিসেবে হযরত দাউদ (আ.) -এর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব দান করেন।

#### অলৌকিক ক্ষমতা লাভ

নবি হিসেবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদা ছিল। আল্লাহ তাঁকে পশ-পাখি, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্ম ও জিন-ইনসানের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“সে (সুলায়মান) বলল : হে মানুষ! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু (জন্ম) দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। (সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৬)

তিনি ছিলেন সুবিশাল রাজ্যের রাজা। শাসনকার্য সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। খুব দ্রুত যাতায়াত করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে বাতাসে ভর করে চলাচল করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তাঁর যখন যে স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন হতো তিনি বাতাসকে আদেশ করলে বাতাস তাঁকে তাঁর বিশাল সিংহাসন ও লোকবলসহ মুহূর্তে সে স্থানে পৌছে দিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

*وَلِسْلَيْمَنَ الرِّجُعُ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَاحِهَا شَهْرٌ*

অর্থ: “আর আমি বায়ুকে সুলায়মানের অধীন করেছিলাম। সে সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত ও সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (সূরা সাবা, আয়াত: ১২)

আল্লাহ তায়ালা জিনদের মধ্য হতে একদলকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অধীন করে দিলেন। তারা হযরত সুলায়মানের জন্য সমুদ্র হতে মুক্তা সংগ্রহ করে আনত। এ ছাড়া অন্যান্য কাজও করত। যেমন, সু-উচ্চ প্রাসাদ, চৌরাচার ন্যায় বড় পেয়ালা ইত্যাদি নির্মাণ করত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

*وَالشَّيْطَنِ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ*

“(আর আমি অনুগত করে দিলাম) শয়তানদের, যারা সকলেই ছিল প্রাসাদনির্মাণকারী ও ডুরুরি।”  
(সূরা সাদ, আয়াত:৩৭)

তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য গোয়েন্দার কাজ করতে আল্লাহ পাক তাঁকে ‘হৃদহৃদ’ নামক একটি পথি দিয়েছিলেন। সে পাথিটি তাঁকে রানি বিলকিস ও তার রাজত্বের সংবাদ দিয়েছে। এ সবই তাঁর অলৌকিক শক্তির নির্দর্শন।

### বিচার শক্তি

হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তি ছিল খুবই প্রথর। আল্লাহ তায়ালা তাকে খুব সৃষ্টিভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খুব বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।

একদা দুজন নারী একটি শিশুর মাতৃত্ব দাবি করল। এর মীমাংসা করার জন্য তারা হ্যরত দাউদ (আ.)-এর নিকট এলো। সেখানে হ্যরত সুলায়মান (আ.) ও উপস্থিত ছিলেন। হ্যরত সুলায়মান (আ.) বললেন শিশু হলো একটি অথচ দাবিদার দুজন। তাহলে শিশুটি কেটে দুভাগ করে দুজনকে দিয়ে দেওয়া হোক। একথা বলে হ্যরত সুলায়মান (আ.) একটি ছুরি হাতে নিলেন। শিশুটিকে মাটিতে শুইয়ে দু'ভাগ করার জন্য উদ্যত হলেন। তখনই একজন নারী কাঁদতে কাঁদতে বললেন। আল্লাহর দোহাই! শিশুটিকে কাটবেন না আমি আমার দাবি ত্যাগ করলাম। শিশুটিকে জীবিত রাখুন এবং তাকে অপরজনের নিকট দিয়ে দিন। হ্যরত সুলায়মান (আ.) বুঝলেন এ নারীই শিশুটির প্রকৃত মাতা। তখন তিনি তাকে শিশুটি দিয়ে দিলেন এবং অন্যজনকে মিথ্যা বলার দায়ে শাস্তি দিলেন।

বালক বয়সে হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর আরও একটি ঘটনা হলো— একদা দুজন লোক হ্যরত দাউদ (আ.)- এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিচারপ্রার্থী হলো। তাদের একজন ছিল রাখাল অপরজন কৃষক। কৃষক তথা শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগল রাখালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, রাখালের ছাগল রাতে ছাড়া পেয়ে তার সমস্ত ফসল বিনষ্ট করে ফেলেছে। সত্যতা যাচাই করার পর হ্যরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগলের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। মামলার বাদী-বিবাদী উভয়ে রায় শুনে দরবার হতে যাওয়ার পথে হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে দেখা হলে তিনি সব শুনে বললেন-আমি রায় দিলে তা ভিন্ন হতো, উভয় পক্ষের উপকার হতো। হ্যরত সুলায়মান (আ.) তাঁর পিতার নিকট তা ব্যক্ত করার পর তাঁর পিতা বললেন এর চাইতে উভয় রায় কী হতে পারে? হ্যরত সুলায়মান (আ.) বললেন আপনি সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম দ্বারা উপকৃত হোক। আর শস্যক্ষেত্র ছাগলের মালিকের নিকট অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপাদন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগলে বিনষ্ট করার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে তখন তা তার মালিককে বুঝিয়ে দেবে। হ্যরত দাউদ (আ.) এ রায় পছন্দ করলেন এবং তা কার্যকর করতে বললেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَفَهَمْنَاهَا سُلِيمَنٌ وَكُلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

“এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুবিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।” (সূরা আল-আবিয়া, আয়াত: ৭৯)

### বাইতুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণ

হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর পিতা হ্যরত দাউদ (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করার আগে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের আগে তিনি দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমার সন্তানের দ্বারা তা নির্মাণ করাও। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া করুল করলেন। জেরুজালেমের ক্ষমতা গ্রহণ করে হ্যরত সুলায়মান (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এ মসজিদ নির্মাণে অসংখ্য শ্রমিক কাজ করেছেন। মূলত জিন জাতিই এ মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেছিল।

### রাজত্বকাল ও ইন্তেকাল

হ্যরত সুলায়মান (আ.) ৪০ বছর নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন এবং সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব করেন। তার শাসনকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৯৬০-৯২০ সাল পর্যন্ত। তাঁর ইন্তেকালের ঘটনা বিস্ময়কর। বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা ছিল অবাধ্য একদল জিন। তারা হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের আগে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজ শেষ হবে না আর তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ জানলে জিনরাও কাজ করবে না। ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই হ্যরত সুলায়মান (আ.) উদ্বৃত্ত এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশে ব্যবস্থা নিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত মেহরাবে (বিশেষ কক্ষ) প্রবেশ করলেন। তিনি নিয়ম অনুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হতো তিনি ইবাদতরত আছেন। জিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। এমতাবস্থায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়। এর মাঝে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজও সমাপ্ত হয়। অন্য দিকে আল্লাহর ইচ্ছায় হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর লাঠি উই পোকায় থেয়ে ফেলে।

লাঠি পড়ে গোলে হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন সবাই জানতে পারল যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বছর। আল্লাহর বাণী-

“যখন আমি তার (সুলায়মানের) মৃত্যু ঘটালাম তখন জিনদিগকে তার মৃত্যুর বিষয়ে জানাল কেবল মাটির পোকা, যা তার লাঠি খেয়েছিল।” (সূরা আল-সাবা, আয়াত: ১৪)

তাঁকে জেরুজালেমের কুরবাতুস্সাখারে দাফন করা হয়। জানবুদির আলোকে মানবিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় যে উদাহরণ হ্যরত সুলায়মান (আ.) আমাদের শিখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর একটি সূক্ষ্ম বিচার সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ২

### হ্যরত মুসা (আ.)

#### আগমন বার্তা

প্রাচীনকালে মিসরীয় বাদশাহদের ‘ফিরাউন’ বলা হতো। হ্যরত মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফিরাউনের নাম ছিল ওয়ালিদ ইবনু মুসআব। তাঁকে ‘দ্বিতীয় রামসিস’ (Ramses II)ও বলা হয়। ফিরাউন স্বপ্নে দেখে যে, ‘বাইতুল মুকাদ্দাস’ থেকে এক বালক আগুন এসে মিসরকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং তার অনুসারী ‘কিবতি’ সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বনি ইসরাইলদের কোনো ক্ষতি করছে না। ফিরাউন তার রাজ্যের সকল স্বপ্নবিশারদ থেকে একসাথে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চায়। তারা বলল, ইসরাইল বৎশে এমন এক পুত্রসন্তানের আগমন হবে যে আপনাকে ও আপনার রাজত্বকে ধ্বংস করে দেবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফিরাউন ভীষণ উত্তেজিত হলো এবং দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ফিরাউন সেনাবাহিনীকে আদেশ দিল যে, বনি ইসরাইল গোত্রে কোনো পুত্রসন্তান জন্মাহণ করলে তাকে যেন হত্যা করা হয়। এভাবে অসংখ্য ইসরাইলি পুত্রসন্তান ফিরাউনের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়।

#### জন্ম

এমন দুঃসময়ে মৃত্যু পরাওয়ানা কাঁধে নিয়ে হ্যরত মুসা (আ.) জন্মাহণ করলেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মহিমায় ফিরাউনের সেন্যবাহিনী এ সংবাদ জানতে পারল না। অপরদিকে হ্যরত মুসা (আ.)-এর জননী খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর ইশ্বারায় হ্যরত মুসা (আ.)-কে তাঁর মাতা সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। আল্লাহর কী মহিমা! সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফিরাউনের রাজ প্রাসাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়ল। ফিরাউনের স্ত্রী হ্যরত আসিয়া (আ.) সিন্দুকটি খুললেন। ফুটফুটে একটি সুন্দর শিশু দেখে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। নিঃসন্তান হ্যরত আসিয়া (আ.) শিশুটি লালন-পালন করতে লাগলেন। শিশু মুসা অন্য কারো দুধ পান না করায় তাঁর মাকেই ধাত্রী নিয়োগ করা হলো। মহান আল্লাহর কুদরতে মুসা (আ.)

তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানেই ফিরআউনের ঘরে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। আল্লাহ বলেন-

فَرَجَعْنَكِ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنِهَا وَلَا تَحْزَنْ ط

“তখন আমি তোমাকে (মুসা-কে) তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে দৃঢ় না পায়।” (সূরা তা-হা, আয়াত: ৪০)

শিশুকালে ফিরআউন একবার মুসা (আ.)-কে কোলে তুলে নেয়। তখন শিশু মুসা (আ.) ফিরআউনের দাঢ়ি ধরে তার মুখে চড় মারেন। এতে ফিরআউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করতে চাইল এবং বলল এই সেই শিশু যে আমার রাজত্ব ধ্বংস করবে। তখন হযরত আসিয়া (আ.) এক ভয়ংকর অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে শিশু মুসাকে ফিরআউনের রোষানল থেকে রক্ষা করেন। তখন অগ্নি মুখে নেওয়ায় তার মুখে জড়তা তৈরি হয়।

### মাদইয়ানে হিজরত

একদা হযরত মুসা (আ.) দেখতে পেলেন একজন কিবতি জনেক ইসরাইলিকে অত্যাচার করছে। তিনি অত্যাচারিত লোকটিকে বাঁচানোর জন্য অত্যাচারী কিবতি লোকটিকে একটি ঘূর্ষি মারলেন। এতে লোকটি মারা যায়। হযরত মুসা (আ.) হতবাক হয়ে যান এবং ফিরআউনের ভয়ে মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ানে হিজরত করেন। সেখানে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত মুসা (আ.) তাঁর সান্নিধ্যে দশ বছর অতিবাহিত করেন। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কর্মদক্ষতা, চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সফুরাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন।

### নবুয়ত লাভ

মাদইয়ানে কিছুকাল অবস্থানের পর মুসা (আ.) তাঁর পরিবারসহ মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তুর পাহাড়ের পাদদেশে আসার পর সন্ধ্যা হয়ে যায়। রাত্রি যাপনের জন্য তিনি পাহাড়ের নিকটে ‘তুয়া’ নামক পবিত্র উপত্যকায় তাঁরু স্থাপন করেন এবং সেখানে নবুয়ত প্রাণ্ণ হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব, যা প্রত্যাদেশ হয় তা শুনতে থাকো।” (সূরা তা-হা, আয়াত: ১৩)  
আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে কথাবার্তা বলতেন।  
আর এ কারণে তাঁকে ‘কালিমুল্লাহ’ বলা হতো।

### দীনের দাওয়াত

নবুয়ত লাভের পর হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পদ্ম থেকে দীন প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন। যেহেতু তাঁর মুখে জড়তা ছিল তাই তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ হযরত হারুন (আ.)-কে নবুয়ত দান করেন এবং

তাকে মুসা (আ.)-এর সহযোগী করে দেন। হ্যরত মুসা (আ.) হ্যরত হারুন (আ.)-কে নিয়ে ফিরআউনের কাছে যান এবং দীনের দাওয়াত দেন। আল্লাহর তায়ালা বলেন-

“ফিরআউনের নিকট যাও নিশ্চয়ই সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। অতঃপর বলো, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আর আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যাতে তুমি তাকে ভয় করো।” (সূরা আল-নাফিয়াত, আয়াত: ১৭-১৯)

হ্যরত মুসা (আ.) ফিরআউনকে তার মু'জিয়াগুলো দেখালেন এবং তাকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার কথা বললেন। ফিরআউন এতে কর্ণপাত করল না। উপরন্তু সে হ্যরত মুসা (আ.)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল।

### সত্যের জয়

হ্যরত মুসা (আ.) ফিরআউনের ঘড়্যন্ত বুঝে ফেললেন। তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। ফিরআউন হ্যরত মুসা (আ.) ও তাঁর দলবলের মিসর ত্যাগের খবর শুনে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁদের পিছে ছুটল। হ্যরত মুসা (আ.) তাঁর দলবল নিয়ে নীল নদের তীরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে ফিরআউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাঁদের খুব কাছাকাছি চলে এলো। তখন মুসা (আ.)-এর অনুসারীরা ভয় পেয়ে গেল। মুসা (আ.) তাদের সাম্মনা দিয়ে বললেন, নিশ্চয় আমার রব আমাদেরকে পথ দেখাবেন। আল্লাহর নির্দেশে হ্যরত মুসা (আ.) তাঁর লাঠি দ্বারা নদীতে আঘাত করলেন। নদীর পানিতে রাস্তা তৈরি হলো। বনি ইসরাইলের ১২টি দলের জন্য ১২টি পথ হয়ে গেল। হ্যরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা নিরাপদে নদী অতিক্রম করলেন। ফিরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী হ্যরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের নদী পার হতে দেখে তাঁদের অনুসরণ করল। যখন তারা নদীর মাঝখানে পৌছল তখনি রাস্তা নদীর পানিতে মিশে গেল। ফলে ফিরআউন তার দলবলসহ ডুবে মরল। আল্লাহর নবিকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাই ধ্বংস হলো। আর এভাবে সত্যের জয় হলো।

### তাওরাত লাভ

আল্লাহ তায়ালা হ্যরত মুসা (আ.)-কে তাওরাত কিতাব দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। তিনি আল্লাহর আদেশে তাওরাত কিতাব আনতে তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে ত্রিশ দিন থাকার ইচ্ছা করলেন কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় আর দশ দিন বেশি অবস্থান করলেন। তুর পাহাড়ে হ্যরত মুসা (আ.) রোয়া, ইতিকাফ ও কঠোর সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তিনি তুর পাহাড়ে থাকাকালীন সময়ে তাঁর ভাই হ্যরত হারুন (আ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এমতাবস্থায় তাঁর অনুসারীদের অনেকেই ‘সামেরি’ নামক এক ব্যক্তির ধোকায় পড়ে গো-বৎস পূজা শুরু করে। হ্যরত মুসা (আ.) তাওরাত কিতাব নিয়ে এসে তাদের এ অবস্থা দেখে ক্ষুক ও মর্মাহত হলেন। তখন তাওরা হিসেবে গো-বৎস পূজারিদের একে অপরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলো। যার ফলে সক্তর হাজার বনি ইসরাইল নিহত হয়।

হযরত মুসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) আল্লাহর নিকট খুব কান্নাকাটি করেন। অবশ্যেই আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন।

হযরত মুসা (আ.) ১২০ বছর বয়সে সিনাই উপত্যকায় ইন্দোকাল করেন। তাঁকে তুর পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়। আমরা হযরত মুসা (আ.) এর মতো নিষ্ঠীক হয়ে সত্যের পথে মানুষকে ডাকব। সৎ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণের মধ্যেই জীবনের সাফল্য নিহিত।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত মুসা (আ.)-এর মুজিয়ার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

### পাঠ ৩

#### হযরত ঈসা (আ.)

#### পরিচয়

মানুষের মুক্তির পয়গাম নিয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব নবি ও রাসূল আগমন করেছেন হযরত ঈসা (আ.) তাদের অন্যতম। ফিলিস্তিনের ‘বাইত লাহম’ (বেথেলহাম) নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম মারিয়াম বিনতে হার্লা বিনতে ফাখুজ। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর হৃকুমে পিতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল হতেই খ্রিস্টান গণনা করা হয়। পবিত্র কুরআনে তাঁকে ‘মাসিহ ইবনু মারিয়াম’ কালিমাতুল্লাহ ও বুঝল্লাহ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর উপর আসমানি কিতাব ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে।

#### মুজিয়া

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মুজিয়া (অলৌকিক ক্ষমতা) দান করেন। তিনি দোলনায় থাকাবস্থায় বাকশক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা মুজিয়া হিসাবে তাঁকে মৃতকে জীবিত করা, জন্মাদ্বকে চক্ষুদান করা, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করার শক্তি দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহর হৃকুমে মাটির তৈরি পাথিতে ফুৎকার দিয়ে জ্যান্ত বানিয়ে ফেলতেন। আল্লাহ বলেন-

“আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাথির আকৃতি তৈরি করব। অতঃপর তাতে ফুৎকার দেব। ফলে আল্লাহর হৃকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মাদ্ব ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর হৃকুমে মৃতকে জীবিত করব।” (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৪৯)

#### হত্যার ষড়যন্ত্র

১০ হযরত ঈসা (আ.) ইহুদিদেরকে তাদের অপকর্ম হতে বাধা দিলে তারা তাঁর উপর খুব ক্ষিণ্ঠ হয় এবং তাঁকে

অনেক কষ্ট দেয়। পাশাপাশি হত্যার ঘড়্যজ্ঞাও করে। এ হীন উদ্দেশ্যে তারা হ্যরত ইসা (আ.)-এর ঘর অবরোধ করে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য ‘তাইতালানুস’ নামক জনেক নরাধমকে পাঠায়। কিন্তু মহান আল্লাহ হ্যরত ইসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। আর ‘তাইতালানুস’ নামক ঐ ব্যক্তিকে হ্যরত ইসা (আ.)-এর আকৃতি দান করেন। সে হ্যরত ইসা (আ.)-কে কোনো কিছু করতে না পেরে বাইরে চলে আসে। অপেক্ষমান লোকজন তাকে হ্যরত ইসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করে। অতঃপর সবাই মিলে তাকে ত্রুশ বিন্দু করে হত্যা করে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

“তারা তাকে (ইসা-কে) হত্যাও করেনি ত্রুশবিন্দু করেনি বরং তারা একপ ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল, যারা তার সম্পর্কে মতবিরোধ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যক্তীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজাময়।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫৭-১৫৮)

### পুনরায় দুনিয়ায় আগমন

শেষ জামানায় পৃথিবী ধ্বন্স হওয়ার আগে হ্যরত ইসা (আ.) পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। এসে তিনি ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। জিয়িয়া প্রথা (অমুসলিম থেকে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর) তুলে দেবেন। ত্রুশ ভেঙে ফেলবেন। সমস্ত শূকর মেরে ফেলবেন। আল্লাহর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এ সময় পৃথিবীর লোকজনের আর্থিক অবস্থা এত উন্নত হবে যে, দান-সদকা নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হ্যরত ইসা (আ.) মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মত হয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। এরপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁকে রাসুল (স.)-এর রওজা মুবারকের পাশে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন তাঁরা দুজন একই স্থান হতে উঠবেন।

### হ্যরত ইসা (আ.) সম্পর্কে ভাস্তবিশ্বাস

খ্রিস্টানরা নিজেদেরকে হ্যরত ইসা (আ.)-এর উম্মাত মনে করে। অধিকাংশ খ্রিস্টান বিশ্বাস করে যে, হ্যরত ইসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, মারিয়াম (আ.) আল্লাহর স্ত্রী এবং হ্যরত ইসা (আ.)-কে ইহুদিরা ত্রুশবিন্দু করে হত্যা করেছে। তবে কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান যারা হ্যরত ইসা (আ.)-এর প্রতি ইমান এনেছিল ও তাঁকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে পবিত্র কুরআনে ‘হাওয়ারি’ (সাহায্যকারী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যারা হ্যরত ইসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ أَللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝

“বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক অद্বিতীয়। আল্লাহ মুখাপেষ্টী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেষ্টী। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।” (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৩)

হ্যরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। তাঁকে আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিকে হ্যরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। হ্যরত ঈসা (আ.) সংসারত্যাগী ছিলেন। কোনো ঘরও বাঁধেননি এবং বিয়েও করেননি। সারা জীবন তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রচার করে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর উম্মতেরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে শিরকে লিঙ্গ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হ্যরত আদম (আ.)-কে পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর জন্ম হ্যরত ঈসা (আ.)-কে শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়।

তাই হ্যরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলার কোনো কারণ নেই। হ্যরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সকলের উচিত তাঁর ব্যাপারে সঠিক আকিদা পোষণ করা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তিনি স্বাভাবিকভাবেই ইস্তিকাল করবেন। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না এবং হ্যরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসুল হিসেবেই বিশ্বাস করব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর মুজিয়ার একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করবে।

## পাঠ ৪

### হ্যরত মুহাম্মদ (স.)

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মদিনায় অবস্থানকালে মাতৃভূমি মক্কার প্রতি দরদ অনুভব করেন। তাই তিনি ষষ্ঠি হিজরি সনে ১৪০০ সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা অভিমুখে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মক্কার অদূরে হৃদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাণ হন। তখন হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ও মক্কার কাফিরদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐতিহাসিকগণ এটাকে হৃদায়বিয়ার সন্ধি বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে এ সন্ধিকে “ফাতহুম মুবিন” (সুম্পষ্ট বিজয়) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

### মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

#### কারণ

হৃদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মুসলমানদের স্তত্ত্ব ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

সন্ধিতে দশ বছর পারম্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার কথা উল্লেখ ছিল। হৃদায়বিয়ার সম্পাদিত চুক্তির

শর্তনুযায়ী আববের বনু খুয়া'আ গোত্র মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চৃক্ষিতে আবদ্ধ হয়। বনু বকর গোত্র হৃদাইবিয়ার সঙ্গি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা একরাতে মহানবি (স.)-এর সাথে মৈত্রী চৃক্ষিতে আবদ্ধ বনু খুয়া'আ গোত্রের উপর আক্রমণ করে। এতে বনু খুয়া'আ গোত্রের কয়েক ব্যক্তি নিহত হয়। আহত হয় আরও অনেকে। বনু খুয়া'আ গোত্রের লোকজন ঘটনাটি মহানবি (স.)-কে জানায়। তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করে। মহানবি (স.) চৃক্ষি অনুযায়ী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। দৃত মারফত কুরাইশদের কাছে তিনি এ ঘটনার কৈফিয়ত তলব করেন। তিনি তাদের জানালেন-

- ক. তোমরা খুয়া'আ গোত্রকে ক্ষতিপূরণ দাও;
- খ. অথবা বনু বকর গোত্রের সাথে মিত্রতা চৃক্ষি বাতিল কর;
- গ. অথবা হৃদায়বিয়ায় সম্পাদিত চৃক্ষি বাতিল কর।

কুরাইশরা শেষটাই গ্রহণ করল। হৃদায়বিয়ার সঙ্গি বাতিল হয়ে গেল।

ফলে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য হৃদায়বিয়া চৃক্ষির বাধ্যবাধকতা আর রইল না। পরে কুরাইশরা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারল। তখন আপস-মীমাংসার জন্য কুরাইশরা আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠাল। এ পর্বে আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। অপরদিকে মহানবি (স.) মুক্ত অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

### মুক্ত বিজয়

হিজরি অষ্টম বছরের রমজান মাসে দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মহানবি (স.) মুক্ত অভিযানে যাত্রা শুরু করেন। মহানবি (স.) মুক্ত অভিযানে 'মারবুজ জাহরান' নামক স্থানে তাঁর গেড়ে অবস্থান নেন। অপ্রত্যাশিতভাবে উপনীত এ বিশাল বাহিনী দেখে আবু সুফিয়ানসহ মুক্তাবাসী হতবাক হয়ে যায়। তারা বাধা দেওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে। বিনা বাধায় মহানবি (স.) জন্মভূমি মুক্ত জয় করেন। স্বীয় জীবন ও ইসলাম রক্ষা করার জন্য মহানবি (স.) একদিন মুক্ত হেড়ে মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ বিজয়ী বীর বেশে তিনি জন্মভূমি মুক্তায় প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তিনি আজ মুক্তার একচ্ছত্র অধিপতি। সত্যের বিজয় হলো আর মিথ্যার পরাজয় হলো। সত্যের পথে থাকলে বিজয় একদিন আসবেই।

### মহানবি (স.)-এর উদারতা

মুক্তার যে সকল লোক একদিন মহানবি (স.) এর জীবন নাশ করতে চেয়েছিল আজ তারাই তাঁর সম্মুখে অপরাধী ও দয়া ভিখারি হিসেবে উপস্থিত। মহানবি (স.) তাদের জিজেস করালেন, "তোমরা আজ আমার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করো।" তারা বললো- **أَخْ كَرِيمٌ هُوَ أَنْتَ وَمَنْ يُهُنُّ** অর্থ- "আপনি আমাদের দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র, আপনার নিকট দয়াপূর্ণ ব্যবহারই আমরা চাই।"

তখন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন- ﴿إِذْكُرُوا فَأَنْشُمُ الظَّلَاقَ﴾ অর্থ- “আজ তোমাদের বিরুক্তে কোনো অভিযোগ নেই, যা ও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।”

দয়ালু নবি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। এমনকি একসময়ের ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রু আবু সুফিয়ানকেও ক্ষমা করে দিলেন। উহুদ যুদ্ধে এ আবু সুফিয়ানই কুরাইশ বাহিনীর (অমুসলিম বাহিনী) নেতা ছিল। তার নেতৃত্বেই কাফির বাহিনীর হাতে ৭০ জন মুসলমান সৈনিক শাহাদাত বরণ করেছিলেন। মহানবি (স.)-এর একটি দাঁত মোবারক ঐ যুদ্ধে শহিদ হয়। এত কিছুর পরও মহানবি তাকে ক্ষমা করেছিলেন। শুধু ক্ষমাই শেষ নয়। মহানবি (স.) আরও ঘোষণা দিলেন “স্বীয় ঘর ও কাবা শরিফের পাশাপাশি যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তারাও ক্ষমা এবং নিরাপত্তা পাবে।” মহানবি (স.) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকেও ক্ষমা করলেন। হিন্দা মহানবি (স.)-এর প্রিয় চাচা হযরত হাময়া (রা.) শহিদ হওয়ার পর তাঁর নাক, কান কেটেছিল এবং বুক চিরে কলিজা বের করে চর্বণ করে চরম নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতার পরিচয় দিয়েছিল। তাকেসহ মক্কার সকলকে ক্ষমার এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

### মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আত্মবন্ধন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা হতে হিজরত করে আসা মুহাজির ও মদিনায় বসবাসকারী আনসারদের মধ্যে আত্ম বন্ধন তৈরি করেছিলেন। আত্ম বন্ধন অটুট রাখার জন্য মহানবি মসজিদে নববিকে মিলনকেন্দ্র বানিয়ে দিলেন। এ আত্ম শুধু মুখে মুখে ছিল না বরং মুহাজিরদেরকে আনসারদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনু মালিকের ঘরে যেদিন এ আত্মবন্ধন তৈরি করেছিলেন গ্রে মোট ৯০ জন সাহাবি ছিলেন। তাঁদের অর্ধেক ছিল মুহাজির আর বাকি অর্ধেক ছিল আনসার। সম্পত্তিতে মুহাজিরদের উত্তরাধিকার বিধানটি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। জন্মসূত্রে আবদ্ধ না হয়ে এমন আত্মবন্ধন মানব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

### বিদায় হজের ভাষণ

সূরা আন-নাস্র নাজিল হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (স.) বুঝতে পারলেন যে, তার জীবন প্রায় শেষ। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে (দশম হিজরি) ২৩শে ফেব্রুয়ারি লক্ষাধিক সাহাবিকে সাথে নিয়ে হজ করতে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। একে বিদায় হজ বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) ৯ই জিলহজ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমূহের সামনে যে ভাষণ দেন, তাকে বিদায় হজের ভাষণ বলা হয়। উক্ত ভাষণে তিনি ব্যক্তিজীবন থেকে রাস্ত্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বপ্রকার দায়িত্ব, লেনদেন, পারম্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। নিম্নে বিদায় হজে প্রদত্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো। আরাফাতের ময়দান সংলগ্ন ‘জাবালে রহমত’ এর উঁচু টিলায় উঠে মহানবি (স.) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন:

১. হে মানব সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ, আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কি না জানি না।

২. আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পরিত্র, তেমনই তোমাদের জীবন ও সম্পদ পরম্পরের নিকট পরিত্র।
৩. মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন সকলকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে।
৪. হে বিশ্বাসীগণ, স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।
৫. সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে ও সুদ খাবে না।
৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করো না।
৭. মনে রেখো! দেশ, বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ হতে বৎসরগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হলো। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহ-ভীতি বা সৎকর্ম, সে ব্যক্তিই সবচেয়ে সেরা যে নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।
৮. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করো না, পূর্বের অনেক জাতি এ কারণে ধ্বংস হয়েছে। নিজ যোগ্যতা বলে গ্রীতদাস যদি নেতৃত্ব হয় তার অবাধ্য হবে না। বরং তার আনুগত্য করবে।
৯. দাস-দাসীদের প্রতি সন্দ্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোন অমাজনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবু তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভাত্তের বন্ধনে আবদ্ধ।
১০. জাহিলি যুগের সকল কুসৎস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী এবং তার রাসূলের আদর্শ রেখে যাচ্ছি। এতে যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপর্যাপ্ত হবে না।
১১. আমিই শেষ নবি আমার পর কোনো নবি আসবেন না।
১২. তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌছে দেবে।

তারপর হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আকাশের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌছাতে পেরেছি? সাথে সাথে উপস্থিত জনসমূহ হতে আওয়াজ এলো “হ্যাঁ”। নিশ্চয়ই পেরেছেন। অতঃপর হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী

থাকো । এর পরই আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন-

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ।  
অর্থ- “আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম । ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করলাম ।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩)

মহানবি (স.) কিছুক্ষণ সময় নীরব থাকলেন । উপস্থিত জনতাও নীরব ছিল । অতঃপর সকলের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ‘আল বিদা’ (বিদায়) । একটা অজানা বিয়োগব্যথা উপস্থিত সকলের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তোলে । বিদায় হজ থেকে ফিরে মহানবি (স.) কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন । অতঃপর ১১ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬৩২ খ্রি: ৭ই জুন সোমবার ইন্তিকাল করেন । তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর ।

### আদর্শ মানব হ্যরত মুহাম্মদ (স.)

জীবনের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নিয়মনীতিকে আদর্শ বলা হয় । এ হিসেবে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) হলেন মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ । আল্লাহ তায়ালা বলেন-  
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ  
অর্থ- “নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উন্নত আদর্শ ।” (সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত: ২১)

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়েই হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের আদর্শ ।

#### ক. হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যক্তিগত আদর্শ

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, হাস্যোঞ্জল ও দয়ালু ছিলেন । ধনী, দরিদ্র, ইয়াতিম, অসহায়, রাজা-প্রজা সকলের সাথে তার আচরণ ছিল অনুকরণীয় । তাঁর দয়া ও ভালোবাসা সকলের পাশাপাশি শিশুদের প্রতিও ফুটে ওঠে । তিনি শিশুদের প্রতি সদয় আচরণ করতেন । অন্যকেও তা করতে উৎসাহ দিয়েছেন । হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْكِمْ صَفِيْرَتِ  
অর্থ- “যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া করে না সে আমাদের দলভূক্ত নয় ।” (তিরমিয়ি)

ক্রীতদাস থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, আত্মীয়-অনাত্মীয় এমনকি জীবজন্মের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন । তিনি বলেন- “জমিনে বসবাসকারীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানবাসীরাও তোমাদের প্রতি দয়া করবে ।” (তিরমিয়ি)

এক কথায়, ক্ষমাশীলতা, উদারতা, সততা ও সত্যবাদিতা, সংযম, ন্যায়পরায়ণতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আত্মবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম ও ওয়াদা পালনসহ অনুসরণীয় গুণাঙ্গণ রাসুল (স.)-এর জীবনে বিদ্যমান ছিল ।

### খ. হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর পারিবারিক আদর্শ

পরিবার সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য একজন মানুষের জীবনে যতগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন সব গুলই মহানবি (স.)-এর জীবনে ছিল। তিনি স্ত্রী-কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলের জন্য আদর্শ ছিলেন। পরিবারের যেকোনো সদস্য তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। তাদের সাথে সদা সত্য কথা বলতেন। মিথ্যাকে তিনি আজীবন ঘৃণা করতেন। তাঁর ব্যবহারে ন্যূনতা প্রকাশ পেত। তিনি পরিবারের সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কোনো বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। পরিবারের কারো প্রতি রাগ করলে শুধু মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ভালো-মন্দ কিছু বলতেন না। তাঁর পরিবারে একাধিক স্ত্রী থাকার পরও তিনি সকলের সাথে সমান আচরণ করতেন। তাঁর আচরণের কারণে পরিবারের কোনো সদস্যের মাঝে কখনো ঝাগড়া বিবাদ হয় নি।

### গ. হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সামাজিক আদর্শ

বিশ্ব শান্তির অগ্রদুত মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তাঁর সমস্ত জীবনই ছিল নানা ধরনের সংক্ষারে নিবেদিত। সমাজ ও জাতীয় জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা তিনি সুন্দর ও কল্যাণমূখী করে সংক্ষার করেননি। সামাজিক অত্যাচার ও অঙ্ককার অনাচারে নিমজ্জিত আরব সমাজে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

জাহেলি যুগে বিভিন্ন কারণে গোত্রবন্ধ লেগে থাকত। সামান্য কারণেই গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যেত। তা ছাড়া আরব মরুচারী গ্রাম্য লোকেরা লুটতরাজ করত। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটালেন এবং লুটতরাজ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেন। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের অনেক গোত্রে ও সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। তারা কেবল ভোগের পাত্রী ছিল। উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হতে তারা বধিত ছিল। মহানবি (স.) নারীদের এসব দুর্গতি হতে রক্ষা করেন। তাদের ধর্মীয় সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেন। তিনি ঘোষণা করেন-  
‘**أَقْلِمْ أَنْتَ وَمَنْ تَرْكَ**’ অর্থ-‘মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।’ (কানযুল উম্মাল)

মহানবি (স.) কন্যাসন্তানকে জীবিত করব দেওয়া বন্ধ করেন। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়াকে অভিশাপের পরিবর্তে সম্মানের বলে আখ্যা দেন। সুন্দরভাবে কন্যাসন্তান লালন-পালনকারীর জন্য বেহেশতের ঘোষণা দেন। ধনী-গরিব সকলের জানায় অংশগ্রহণ করতেন। গোলাম-দাসী সকলের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। তাঁর আচার-আচরণে হতাশাগ্রস্থ মানুষ দিকনির্দেশনা পেত।

এ ছাড়া তিনি সামাজিক সকল অনাচার ও বৈষম্য দূর করেন। ছোট-বড় সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সকল প্রকারের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় যেমন-সুন্দ, ঘৃষ, মদ, জুয়া ও বেহায়াপনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। এভাবে তিনি সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

#### ঘ. হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাজনৈতিক আদর্শ

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) পরিপূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় আল কুরআনের সর্বজনীন গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেন।

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের অনেক সমাজ ও গোত্র ‘জোর যার মূলুক তার’ এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। মহানবি (স.) দেশ পরিচালনায় জনগণের মতামতের স্বীকৃতি দেন। যা গণতান্ত্রের মূল কথা। তিনি ধনী, গরিব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বৰ্গ, গোত্র সকল বৈষম্যের অবসান ঘটান। রাষ্ট্রের সকলের সমাধারণ ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অমুসলিম নাগরিকদেরও নিরাপত্তা দেন। তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের চোখে মুসলিম-অমুসলিম, ধর্ম, বৰ্গ-গোত্র সকলে সমান এ নীতির বাস্তবায়ন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ভিত্তি মজবুত করার জন্য মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তি ‘মদিনা সনদ’ নামে পরিচিত।

#### ঙ. মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শ

মহানবি (স.) তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত চক্ৰবৃক্ষ হারে সুন্দের যে প্রচলন ছিল তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুন্দের পরিবর্তে ব্যবসাকে উৎসাহিত করেন। আল্লাহ বলেন- **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا**

“আর আল্লাহ সুন্দকে হারাম (নিষিদ্ধ) আর ব্যবসাকে হালাল (বৈধ) করেছেন।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫)

ঘৃষ প্রথাও তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন: “ঘৃষ গ্রহীতা ও ঘৃষ দাতা উভয়ে জাহান্নামি”। সমাজ থেকে তিনি প্রতারণামূলক সকল ব্যবসা বন্ধ করে দেন। সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। সম্পদে যাতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত থাকে তার উদ্দেয়গ নেন। রাজস্বের উৎস হিসেবে যাকাত, গণিমত (যুদ্ধকর্ক সামগ্রী), জিয়িয়া (অমুসলিম হতে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর), খারাজ (অমুসলিমদের ভূমিকর), উশর (মুসলিমদের উৎপন্ন ফসলের কর) ইত্যাদি গ্রহণ করেন।

## পাঠ ৫

### হ্যরত আয়েশা (রা.)

#### পরিচয়

হ্যরত আয়েশা (রা.) ছিলেন হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রী। তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা। তাঁর মায়ের নাম উম্মে বুম্মান। তাঁর উপাধি ছিল ‘সিদ্দিকা’ ও

‘হমায়রা’। আর তাঁর উপনাম হলো-উম্মুল মুমিনিন ও উম্ম আব্দুল্লাহ। তিনি হিজরতের পূর্বে ৬১৩/৬১৪ খ্রিস্টাব্দে মুক্তায় জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ বংশের নিয়মানুযায়ী জন্মের পর তাঁর লালন-পালনের ভার দেওয়া হয় ওয়ায়েল নামে এক লোকের স্ত্রীর উপর। শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রথম মেধার অধিকারী। শিশুকাল থেকে তাঁর শিক্ষাগ্রহণ শুরু হয়। শৈশবকালেই তাঁর আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা ও মেধাশক্তি সকলকে মুক্ত করেছিল। তাঁর মধ্যে সর্বদা শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তিনি অন্য শিশুদের মতো খেলাখুলা, আমোদফূর্তি ও দৌড়াদৌড়ি করতে ভালোবাসতেন।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর নবুয়াতের দশম সনে মহানবি (স.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। হযরত খাওলা বিনতে হাকিম ছিলেন এ বিবাহের ঘটক। এ বিয়েতে দেনমোহর নির্ধারিত হয় ৪৮০ দিরহাম। বিবাহের তিন বছর পর রাসুল (স.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)-এর দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। হযরত আবু বকর (রা.) বিবাহের কাজির দায়িত্ব পালন করেন।

### শিক্ষাজীবন

তৎকালীন আরব সমাজে লেখা-পড়ার তেমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। হযরত আয়েশা (রা.) পিতার কাছ থেকেই মূলত লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। যা একবার শুনতেন সাথে সাথে মুখস্থ করে ফেলতেন। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন ছাড়াও তিনি গৃহস্থালী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

### ইফকের ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরি সনে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে রাসুল (স.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)ও ছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। হারানো হার খুঁজতে গিয়ে তিনি কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যান। ফিরতে দেরি হয়ে যায়। এ সুযোগে মুনাফিকরা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করল। এতে তিনি চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন একেবারে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি ধৈর্য হারাননি। আল্লাহর উপর আস্থা রেখে অটল ছিলেন। এ সময়ে রাসুল (স.) ও কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেননি। তিনি চিন্তিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর পিতামাতাও চরম উৎকষ্টা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। অবশেষে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পরিব্রতা বর্ণনা করে সূরা নুরে ১১-২১ নম্বর আয়াত নাজিল হলো। মুনাফিকদের ঘড়্যক্ষ ব্যর্থ হলো। রাসুল (স.) চিন্তামুক্ত হলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর পরিব্রতা ও চারিত্রিক মাধুর্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

### শিক্ষায় অবদান

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ ব্যৃৎপত্তি অর্জন করেন। বিশেষ করে তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ও আরবদের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শরিয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েল ও নীতিগত বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নেওয়া হতো। তুলনামূলক কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০টি। তন্মধ্যে ১৭৪টি হাদিস ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি ৫৪টি হাদিস এবং ইমাম মুসলিম ৬৯টি হাদিস এককভাবে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইবনে শিহাব জুহুরি বলেন, ‘তিনি (আয়েশা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন।’ (তাহজিবুত্ত তাহজিব)

### শিক্ষকতা

উম্মুল মুমিনিন হ্যরত আয়েশা (রা.) শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষভাবে নারীদের বিভিন্ন বিষয় তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হতো। তিনি হাদিস শিক্ষাদানে বেশি সময় ব্যয় করতেন। একসাথে তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২০০-এর অধিক। অনেক বড় বড় সাহাবি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ঘটনা, প্রশ্নোত্তর এবং সামাজিক বাস্তবতার আলোকে শিক্ষা দিতেন। হ্যরত আবু মুসা আশআরি (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা.), আমর ইবনু আছ (রা.) প্রমুখ সাহাবি তাঁর হাদিসের পাঠদানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।

### গুণাবলি

হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র ও আদর্শ অতুলনীয়। তিনি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির দ্বারা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে বহুগনের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন, অনন্য সুন্দরী, তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি সম্পন্ন, সত্যের সাধক, আদর্শ স্বামী সেবিকা, জ্ঞানতাপস ও সদালাপী। এক কথায় বলতে গেলে মানবীয় চরিত্রের সকল গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

মুনাফিক ও হিংসুকগণ তাঁর উপর যে অপরাদ দিয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। দৈর্ঘ্যেই তাঁকে স্ত্রি-অবিচল রেখেছিল।

রাতের অধিকাংশ সময় তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। গরিব অসহায়দের দান সদকা করতে তিনি পছন্দ করতেন ও আনন্দ পেতেন। দানশীলতা, মিতব্যয়িতা, দয়া, পরপোকারিতা, ধর্মপরায়ণতাসহ সর্ব প্রকার গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। স্বামী প্রেমও তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসুল (স.) ও তাঁর সাথে খেলাধুলা ও দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি কঠোরভাবে পর্দা করতেন।

## মর্যাদা

হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (স.)-এর অতি আদরের সহধর্মী ছিলেন। তিনি মহানবি (স.)-এর অন্য স্ত্রীদের থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাসূল (স.) বলেন- “নারী জাতির উপর আয়েশা (রা.)-এর মর্যাদা তেমন, যেমন খাদ্যসামগ্রীর উপর সারিদের মর্যাদা।” (বুখারি)। সারিদ হলো আরবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য, যা রুটি, গোশত ও ঝোলের সমন্বয়ে তৈরি হয়। রাসূল (স.) আরও বলেন-“আয়েশা (রা.) হলেন-মহিলাদের সাহায্যকারিনী।” (কানযুল উমাল)

একবার নবি করিম (স.) আয়েশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন-“হে আয়েশা! ইনি জিব্রাইল, তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।” (বুখারি)। হযরত আয়েশা (রা.) নিজ বৃক্ষিমন্তা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। আজকের নারী সমাজও যদি হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতো তপস্যা করেন তাহলে তাঁরাও মর্যাদাবান হবেন।

## ইন্টেকাল

উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা (রা.) ৫৮ হিজরির ১৭ রমযান ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্টেকাল করেন। তাঁকে জাহাতুল বাকি নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ধৈর্য, জ্ঞানসাধনা, পাণিত্য, স্বামীভক্তি ও চারিত্রিক মাধুর্য আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর উন্নত চরিত্রের উপর একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ৬

### হযরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজ (র.)

#### পরিচয়

হযরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজ ৬১ হিজরি সনে উমাইয়া বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল আজিজ। মাতা হলেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর পৌত্রী উম্ম আসিম লায়লা। তিনি একজন উমাইয়া খলিফা ছিলেন। তাঁকে ‘দ্বিতীয় উমর’ ও ইসলামের ‘পদ্মম খলিফা’ বলা হয়।

### শৈশব ও শিক্ষাজীবন

শিশুকাল হতেই তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু ও জ্ঞানতাপস। শিশু বয়সে তিনি পিতার সাথে মিসর গমন করেন এবং দেখানেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। এরপর তিনি কুরআন ও হাদিসের উচ্চতর জ্ঞান লাভের আশায় মদিনায় গমন করেন। তৎকালীন সময়ে মদিনার বিখ্যাত শিক্ষকদের নিকট হতে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির ও আরবি সাহিত্যের উপর উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি উমাইয়া শাসক খলিফা আব্দুল মালিকের কন্যা ফাতিমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

### গভর্নর পদে নিয়োগলাভ

খলিফা ওয়ালিদ, উমর ইবনু আব্দুল আজিজ-কে ৮৭ হিজরি সনে মদিনার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দান করেন। তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ সহকারে দায়িত্ব পালন করেন। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি মজলিশে শুরা গঠন করেন। এর সদস্য ছিলেন দশ জন মুস্তাকি (আল্লাহভীরু) লোক। তিনি শাসনকার্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মজলিশে শুরার মতামত গ্রহণ করতেন।

শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি নেতৃত্ব মূল্যবোধসম্পদ বিচারক নিয়োগ করেন। গভর্নর থাকাকালে তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ কারণে তৎকালীন প্রখ্যাত মনীষী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব তাঁকে 'মাহদি' (সুপথপ্রাণ) উপাধি দিয়েছিলেন।

### জনকল্যাণমূলক কাজ

গভর্নর নির্বাচিত হয়ে উমর ইবনু আব্দুল আজিজ জনসাধারণের কল্যাণার্থে কাজ শুরু করেন। তিনি 'মসজিদে নববি'র সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন করেন। তিনি অসংখ্য ঘরবাড়ি, পয়ঃপ্রণালী ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। পিপাসার্ত মানুষের জন্য তিনি অনেক কৃপ খনন করেন। মসজিদে নববির বাগানে একটি ঝৰ্ণা ও চৌবাচ্চা নির্মাণ করেন। সমগ্র এলাকায় বিশেষ করে মক্কা, মদিনা ও তায়েফের মাঝে চলাচলের জন্য সংযোগ সড়ক তৈরি করেন।

শুধু জনকল্যাণমূলক কাজ নয় তিনি জ্ঞানেরও প্রসার ঘটিয়েছেন। তিনি জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। গভর্নর থাকাকালেও তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন।

### খলিফা পদ লাভ

হিজরি ৯৯ সন মোতাবেক ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফা সুলায়মান ইবনু আব্দুল মালিক ইতিকাল করলে উমর ইবনু আব্দুল আজিজ মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হন।

খলিফা নিযুক্ত হয়ে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের গৃহীত সকল অন্যায় নীতি বাতিল করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে খলিফা নির্বাচনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি উপস্থিত লোকদের বলেন- 'হে মানবমণ্ডলী! আমার অনিছা ও সাধারণ মানুষের মতামত ছাড় আমাকে খলিফা মনোনীত করা হয়েছে। আমি আপনাদের বাধ্য করছি না, আপনারা যাকে ইচ্ছা খলিফা ফর্মা নং-১৭, (ইসলাম শিক্ষা, ৮ম শ্রেণি)

নির্বাচন করুন।' তার এ ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা বলল 'আমরা আপনাকে খলিফা হিসেবে মেলে নিলাম, আমরা আপনার খিলাফতের উপর সন্তুষ্ট।' অতঃপর তিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর প্রাদেশিক গভর্নরদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিতে তিনি উল্লেখ করলেন- "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তার কিতাব মেনে চলো এবং রাসুলের সুন্নাত অনুসরণ কর।"

উমাইয়া বংশের লোকজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাবে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের যে সকল সম্পদ দখল করে রেখেছিল তিনি তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এবং যথাযথ মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এমনকি তাঁর স্ত্রী স্ত্রীর সম্পত্তি, উপচৌকনসামগ্রী, গহনাদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বাইতুল মালে জমা দেন। রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ বাস্তবায়ন করেন। বিশেষ করে হ্যরত উমর (রা.)-এর শাসননীতি অনুসরণ করেন। অনারব মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সর্বজনীন মানবতাবোধে উদ্বৃদ্ধ হয়ে নিরপেক্ষ শাসননীতি প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্র সুখশান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাদের সাম্রাজ্যবাদী ও স্বার্থান্বেষী নীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। রাষ্ট্রে ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মপরায়ণতা, সাম্যের ধারণা ও সকল জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে তাঁকে 'উমাইয়া সাধু' (Umayyad Saint) বলা হয়।

### হাদিস সংকলনে অবদান

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে আল হাদিস। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদিসগুলো হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে হ্যরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। হাদিসগুলো সংরক্ষণ ও সংকলনের জন্য তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের নির্দেশ দেন। তিনি তাদের কাছে লেখেন- 'তোমরা রাসুল (স.)-এর হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলন করো।' তাঁরই প্রচেষ্টায় মুসলিম বিশ্বে হাদিস সংকলিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয়ি, ইবনে মাজাহসহ অন্যান্য হাদিসগুলি সংকলিত হয়। ফলে হাদিস হারিয়ে যাওয়া ও বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

### প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা

উমর ইবনু আব্দুল আজিজ বিশ্বাস করতেন যে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। তিনি গভর্নরদের নিকট প্রেরিত পত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিতেন। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তিনি অনেক প্রশিক্ষক নিয়োগ করেন। শিক্ষকদের জন্য মাথাপিছু মাসিক ১০০ দিনার (ৰ্ঘমুদ্রা) ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে সিঙ্গু, আফ্রিকা, স্পেনসহ বিভিন্ন দেশে ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে।

### কৃতিত্ব

দ্বিতীয় উমর নামে খ্যাত হ্যরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজ রষ্ট্র পরিচালনায় কুরআন-হাদিস ও খোলাফায়ে রাশেদিনের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাই তাঁকে চার খলিফার পর ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয়।

তাঁর আমলে কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভৃতি উন্নতি সাধিত হয়। তিনি মানুষের মাঝে পারস্পরিক বিরোধ দূর করে সাম্য ও সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার এতবেশি উন্নতি হয়েছিল যে, যাকাত গ্রহণ করার মতো লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি ছিলেন একাধারে ফকিহ (ইসলামি আইনশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ), মুজতাহিদ (ইসলাম ধর্মজ্ঞানে সুপণ্ডিত) এবং কুরআন ও হাদিসের হাফিজ।

### চরিত্র

হ্যরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজ ছিলেন আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী, বিনয়ী ও ন্যূন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর অন্তরে এত আল্লাহভীতি ছিল যে, তিনি প্রায় আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। খলিফা হয়েও তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দৈনিক মাত্র দু-দিনহাম ভাতা গ্রহণ করতেন।

একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তিনি অন্য ধর্মালম্বীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তাঁর আমলে খ্রিস্টান, ইহুদি ও অগ্নি উপাসকগণকে তাদের গির্জা ও উপাসনালয় নিজ নিজ অধিকারে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর আমলে সকল ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করত। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে উদার চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। তিনি ‘আইলা’ ও সাইপ্রাসের খ্রিস্টানদের কর কমিয়ে দেন। নাজরানের খ্রিস্টানদের তিনি বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন। জ্ঞানচর্চায় অমুসলিম মনীষীদেরও সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাদের দ্বারা কয়েকটি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

### ইত্তেকাল

এ মহামনীষী ১০১ হিজরি মোতাবেক ৭১৯ খ্রিস্টাব্দের রজব মাসে মাত্র ৪০ বছর বয়সে ইত্তেকাল করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল প্রায় আড়াই বছর। আমরা হ্যরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজের জীবনাদর্শ অনুসরণ করব। তাঁর ধর্মপরায়ণতা, জীবনসাধনা, ন্যায়পরায়ণতা এবং অসাম্প্রদায়িক আদর্শ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করব।

**কাজ :** শিক্ষকার্থীরা হ্যরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজের ধর্মপরায়ণতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বাড়ির কাজ হিসেবে সংক্ষেপে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

## পাঠ ৭

### হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)

#### জন্ম ও পরিচয়

ইসলামের ইতিহাসে নারীদের মধ্যে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) অন্যতম। এ মহান তাপসী রমনী ১৯ হিজরি মোতাবেক ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁকে বসরি বলা হয়। তাঁর পিতা খুব দরিদ্র ছিলেন। যেদিন রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ঐ দিন রাতে তার পিতার ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর মতো তৈলও ছিল না। তাঁর পিতাও একজন মুন্তাকি (আল্লাহভীরু) ছিলেন। চার বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ ছিলেন। তাই তার নাম রাখা হলো রাবেয়া (চতুর্থ)। বাল্য বয়সেই তার পিতামাতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তাঁকে অতি কঢ়ে দিনাতিপাত করতে হয়।

#### ক্রীতদাসী

হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর পিতামাতার ইন্তিকালের পর তার বড় বোনেরা জীবন ও জীবিকার অন্ধেষণে অন্যত্র চলে যান। এ সময়ে বসরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রীত হন। তাঁর মনিব ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। তাই তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করাত। রাবেয়া বসরি দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করতেন। তারপরও রাতের বেলায় বিনিদ্র থেকে শুধু আল্লাহর ইবাদত করতেন।

একদিন রাতে তাঁর মনিবের ঘূম ভেঙে গেল। সে জানলা দিয়ে দেখতে পেল, তার ক্রীতদাসী রাবেয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করছে। উপর হতে একটি বাতি তার ঘর আলোকিত করে রেখেছে। এক পর্যায়ে রাবেয়া মোনাজাত ধরে আল্লাহর দরবারে বললেন, ‘হে আল্লাহ তুমি আমাকে কোনো মানুষের অধীন করে না রাখলে আমি সর্বশক্ত শুধু তোমার ইবাদত করতাম।’ রাবেয়ার মনিব এ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং সকালবেলা তাঁকে পরিপূর্ণ স্বাধীন করে দিল। তিনি জীবনে বিবাহ করেননি। কেবল আল্লাহর ইবাদতে জীবন কাটিয়ে দেন।

#### আল্লাহর ওপর আস্তা ও ইবাদত

তাপসী রাবেয়া বসরি (র.) আল্লাহর উপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি জীর্ণ কুটিরে বসবাস করতেন। তবু কোনো মানুষের সাহায্য গ্রহণ করতেন না। হ্যরত রাবেয়া বসরি অসুস্থ হলে আবুল ওয়াহিদ আমর ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরি তাঁকে দেখতে যান। তখন সুফিয়ান সাওরি হ্যরত রাবেয়া বসরিকে বললেন, যদি আপনি মুখ খুলে বলেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দেবেন। রাবেয়া বললেন, হে আরু সুফিয়ান আপনি কি জানেন না কার ইচ্ছায় আমার এ অসুস্থতা? যাঁর ইচ্ছা তিনি কি আল্লাহ নন? সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ! রাবেয়া বললেন, তাহলে কেন আমাকে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে বলছেন!

মালিক ইবনু দিনার নামে এক লোক রাবেয়া বসরির পরিচিত ছিলেন। তিনি একদা রাবেয়ার আর্থিক দুরবস্থা দেখে বললেন, আপনি বললে আমি আমার এক ধনীবন্ধু থেকে আপনার জন্য সাহায্য আনতে পারি। রাবেয়া বললেন, হে মালিক! আমাকে এবং আপনার বন্ধুকে কি আল্লাহই রিযিক দেন না? মালিক বলল, হ্যাঁ! রাবেয়া বললেন, আল্লাহ কি দরিদ্রকে তার দারিদ্র্যের কারণে ভুলে যাবেন? এবং ধনীদেরকে তাদের ধনসম্পদের কারণে মনে রাখবেন? মালিক বলল, না। তখন রাবেয়া বললেন, আল্লাহ যেহেতু আমার অবস্থা জানেন তখন তাঁকে আমার আবার স্মরণ করানোর দরকার কী?

আল জাহিজ বলেন, রাবেয়ার কয়েকজন পরিচিত লোক তাঁকে বললেন, আমরা যদি আপনার আত্মীয় স্বজনদের বলি তাহলে তারা আপনাকে একজন ক্রীতদাস কিনে দেবেন। রাবেয়া বললেন, সত্য কথা এই যে, যিনি সমস্ত পৃথিবীর মালিক তার কাছেই পার্থিব কিছু চাইতে আমার লজ্জা হয়। অতএব যারা পৃথিবীর মালিক নয় তাদের কাছে কী করে আমি চাইতে পারি?

ইবাদত করার ক্ষেত্রে হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) ছিলেন অতুলনীয়। তিনি যখনই সময় পেতেন তখনই আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। অধিকাংশ সময় তিনি দিনে রোজা রাখতেন আর রাতে নফল নামায পড়তেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন যে, ‘হে প্রভু, আমাকে আমার নিজ কাজে (ইবাদতে) ব্যস্ত রাখুন। যাতে আমাকে কেউ আপনার যিকির (স্মরণ) হতে বিমুখ করতে না পারে।’

### আধ্যাত্মিকতা

শুধু পুরুষরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে এমন নয়। অনেক নারীও আল্লাহর ‘ওলি’ (বন্ধু বা কাছের লোক) হতে পেরেছেন। আল্লাহ তাদের অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়েছেন। হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)-এরও অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল।

একদা হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) একটি হাঁড়িতে কিছু খাদ্যদ্রব্য রাখা করছিলেন। তার একটি পেঁয়াজের দরকার পড়ে। কিন্তু তাঁর ঘরে কোনো পেঁয়াজ ছিল না। তখন একটি পাখি তার ঠোঁটে করে একটি পেঁয়াজ এনে তাঁর কাছে ফেলে দেয়।

হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) একবার শস্য বুনছিলেন। পঙ্গপালেরা শস্যক্ষেত্রের উপর এসে পড়েছিল। তখন রাবেয়া প্রার্থনা করে বললেন, ‘হে আমার প্রভু এ হলো আমার জীবিকা। যদি আপনি চান তাহলে আমি তা আপনার শত্রুদের বা বন্ধুদের দিয়ে দেব।’ তখন পঙ্গপালেরা উড়ে পালিয়ে গেল। ওলি হিসেবে তাঁর থেকে আরও অনেক কারামত প্রকাশিত রয়েছে।

### অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) সদা সর্বদা সহজ সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন না। তিনি সর্বদা নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে করতেন। আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা চাইতেন, সর্বদা আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট তাওবা (অনুশোচনা) করতেন। তিনি বলতেন, ‘মুখে মিথ্যা তাওবা করে কী লাভ যদি কাজে তা প্রমাণ পাওয়া না যায়।’ তিনি সর্বদা আল্লাহর একজন শোকরগুজার (কৃতজ্ঞতা-প্রকাশকারিগী)

বান্দা ছিলেন। খেয়ে, না খেয়ে, দুঃখে-কষ্টে, সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ডাপন করতেন।

### ইন্তেকাল

অনেক শ্রম, কষ্টসাধ্য ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জীবনযাপন করার পর আল্লাহর প্রিয় এই নারী ১৮৫ হিজরি/ ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বসরায় দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, মুহাম্মদ ইবনু তুসী নামক এক লোক তাঁর কবরে যান। গিয়ে বলেন যে, হে রাবেয়া, আপনি গর্ব করতেন যে, উভয় জগতের বিনিময়েও আপনি আপনার মাথা নত করবেন না। আপনি কি সেই উন্নত অবস্থা লাভ করেছেন? জবাবে একটি আওয়াজ এলো— ‘আমি যা চেয়েছিলাম তা আমি পেয়েছি।’

হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবন আধ্যাত্মিকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সংযমের আদর্শে পরিপূর্ণ। আমরা তাঁর জীবনের আলোকে আমাদের জীবন গড়ব। ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাব।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বসে হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর

১. প্রাচীনকালে মিসরীয় বাদশাহদের —— বলা হতো।
২. হ্যরত সুলায়মান (আ.) —— বছর নবুয়াতি দায়িত্ব পালন করেন।
৩. হ্যরত ইসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর ——।
৪. —— নাজিল হওয়ার পর হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবন প্রায় শেষ।

#### বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. অনেক নারী ও	সহজ সরল জীবনযাপন করতেন
২. হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) সদা সর্বদা	আল্লাহর ‘গুলি’ হতে পেরেছেন
৩. আল্লাহ সুন্দরে হারাম আর	শরিক করো না
৪. আল্লাহর সাথে কাউকে	বাঢ়াবাঢ়ি করো না
৫. ধর্ম নিয়ে	ব্যবসাকে হালাল করেছেন

#### সংক্ষিপ্ত-উন্নত প্রশ্ন

১. হ্যরত মুসা (আ.)-এর নবুয়াত লাভের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২. হ্যরত ইসা (আ.) সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের ভ্রান্তিবিশ্বাস কী ছিল?
৩. সংক্ষেপে হৃদায়বিয়ার সঙ্গির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আদর্শ মানব হিসেবে হ্যারত মুহাম্মদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।
২. হাদিস শিক্ষায় হ্যারত আয়েশা (রা.)-এর অবদান বর্ণনা কর।
৩. হ্যারত রাবেয়া বসরি (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত হিজরিতে মক্কা বিজয় হয়?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক. তৃতীয় | খ. পঞ্চম |
| গ. সপ্তম  | ঘ. অষ্টম |

২. হ্যারত মুসা (আ.) কত বছর বয়সে ইস্তেকাল করেন?

- |        |        |
|--------|--------|
| ক. ১১০ | খ. ১২০ |
| গ. ১৩০ | ঘ. ১৪০ |

৩. ‘ফাতহম মুবিন’ বলতে বোঝায়-

- i. সুনির্দিষ্ট বিজয়
  - ii. সুস্পষ্ট বিজয়
  - iii. হৃদয়বিয়ার সঙ্গি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আব্দুল আজিজ তার বন্ধু আব্দুল হাসানকে বলল, বিদায় হজের ভাষণ অনুসরণ করলে মানবজাতির মুক্তি নিশ্চিত হবে। বিদায় হজের ভাষণে স্বামী-স্ত্রীর পরম্পরের প্রতি পরম্পরের দায়িত্ব এবং মানুষের বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে সমান ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্বারূপ করা হয়েছে।

৪. আব্দুল আজিজের বক্তব্যের মাধ্যমে কোন নবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে?

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| ক. হ্যারত সৈসা (আ.)     | খ. হ্যারত মুসা (আ.) |
| গ. হ্যারত মুহাম্মদ (স.) | ঘ. হ্যারত দাউদ (আ.) |

৫. আব্দুল আজিজের বক্তব্য অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে-

- i. শান্তি ও শৃঙ্খলা
  - ii. নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা
  - iii. ভাত্ত ও মূল্যবোধ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মাহবুব সাহেব এবি কলেজের প্রভাষক ছিলেন। কলেজের কয়েকজন প্রভাষক ঘড়যন্ত্র করে তাকে উক্ত কলেজ থেকে ঢাকরিয়ত করেন। তার স্ত্রী শাহিদা বেগম ছিলেন ইসলামি জ্ঞানে খুবই পারদর্শী। তিনি মাহবুব সাহেবকে সান্তুন্না ও সাহস দেন। স্ত্রীর পরামর্শে মাহবুব সাহেব পড়ালেখা করে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। কয়েক বছর পর তিনি শিক্ষা অধিদপ্তরের উৎর্বর্তন কর্মকর্তা হিসেবে এবি কলেজ পরিদর্শনে আসেন। তখন মাহবুব সাহেবের বিরচক্ষে ঘড়যন্ত্রকারীরা তার কাছে ক্ষমা চাইতে আসেন। তিনি তাদেরকে বললেন আপনাদের বিরচক্ষে আমার কোনো অভিযোগ নেই। অমি ক্ষমা করতে ভালোবাসি।

ক. হ্যারত উমর ইবনু আবদুল আজিজ (রা.) কেন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. বিদায় হজ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. শাহিদা বেগম কর্তৃক স্বামীকে পরামর্শ দান হ্যারত আয়েশা (রা.) এর কোন বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “মাহবুব সাহেবের বিরচক্ষে ঘড়যন্ত্রকারীদের ক্ষমা করে দেওয়া মহানবি (স.) এর আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন।” উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

২. মুরাদ সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি এলাকায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। গরিব জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তার ছেলে মুবীন শীতকালীন ছুটিতে বাড়িতে এসে বাবার কার্যক্রমে খুশি হয়। একদিন সকালে ড্রয়িংরুমে বসে তিনি পত্রিকা পড়লেন। হঠাৎ একই গ্রামে বসবাসরত তারিক এসে অভিযোগ করল যে, নয়নের গাড়ী তার ফসল নষ্ট করেছে। তখন তার বাবার অনুপস্থিতিতে উভয়ের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দিল যে, নয়ন শস্যক্ষেত্র পূর্বাবস্থায় ফিরে না আনা পর্যন্ত তারিক নয়নের গাড়ী লালন-পালন করবে ও দুধ ভোগ করবে। উভয় পক্ষ এ সিদ্ধান্তে খুশি হলো। তার পিতাও তাকে ধন্যবাদ জানালেন।

ক. আল্লাহ কেন নবীকে পশুপাথি, কীটপ্রতঙ্গ, জীব-জন্ম ও জিন-ইনসানের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন?

খ. মুজিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. মুরাদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে হ্যারত ওমর ইবনু আবদুল আজিজের কোন আদর্শটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মুবীনের বিচক্ষণতা হ্যারত সুলায়মান (আ.) এর জীবনাদর্শেরই প্রতিফলন- ব্যাখ্যা কর।

# ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম-ইসলাম শিক্ষা

তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করো  
এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

- আল কুরআন



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।